অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

অষ্টপুরের বৃত্তান্ত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



অষ্টপুরের বৃত্তান্ত • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

অষ্টপুরের বৃত্তান্ত

অষ্টপুরের বৃত্তান্ত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দেবাশীষ দেব



আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২

ISBN 978-93-5040-094-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

ASTAPURER BRITTANTA
[Juvenile Fiction]
by
Sirshendu Mukhopadhayay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

১০০.০০

“রা–স্বা”

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীমতী শ্রমণা হালদার কল্যাণীয়াসু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার
উঁহু
কিশোর উপন্যাস সমগ্র ১-৪
কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড
গজাননের কৌটো
গোঁসাই বাগানের ভূত
গোলমেলে লোক
গৌরের কবচ
চক্রপুরের চক্করে
ছায়াময়
ঝিকরগাছায় ঝঞ্ঝাট
ঝিলের ধারে বাড়ি
ডাকাতের ভাইপো
দশটি কিশোর উপন্যাস
দুধসায়রের দ্বীপ
নবাবগঞ্জের আগন্তুক
নবীগঞ্জের দৈত্য
নৃসিংহ রহস্য
পটাশগড়ের জঙ্গলে
পাগলা সাহেবের কবর
পাতালঘর
বক্সার রতন
বটুকবুড়োর চশমা
বনি
বিপিনবাবুর বিপদ
ভুতুড়ে ঘড়ি
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি
মোহনরায়ের বাঁশি
রাঘববাবুর বাড়ি
ষোলো নম্বর ফটিক ঘোষ
সাধুবাবার লাঠি
সোনার মেডেল
হিরের আংটি
হেতমগড়ের গুপ্তধন

নগেন পাকড়াশি তাকে একখানা নতুন সাইকেল, একজোড়া নতুন বাহারি জুতো, একখানা ঝকমকে হাতঘড়ি আর নগদ দশ হাজার টাকা আগাম দিয়েছিল, আর কাজ হয়ে গেলে আরও পাঁচ লাখ টাকার কড়ার। এ ছাড়াও, পাকড়াশির কাছে তার জমি বাড়ি বাঁধা দেওয়ার যেসব কাগজপত্র ছিল, তাও ফেরত দিয়েছিল। বলেছিল, "এই কাজটুকু করে দে বাবা, তোকে রাজা করে দেব।"

তা রাজাগজা বলেই নিজেকে মনে হয়েছিল নবীনের। পাকড়াশির খাজাঞ্চি ভোলারাম একদিন এসে তাকে সব জলের মতো বুঝিয়ে দিল। বলল, "কোনও বিপদ-আপদ নেই রে বাপু, জেলখানায় শুয়ে-বসে কয়েকটা বছর আরামসে কাটিয়ে দেওয়া, দোবেলা খাওয়ার চিন্তা নেই। বিনি মাগনা মুফতে সকালে রুটি-গুড়, দুপুরে মাছ-ভাত, রাতে রুটি-মাংস। চোদ্দো বছর মেয়াদ বটে, কিন্তু বছরে ছ' মাস করে মেয়াদ কমে যায়। হরেদরে তোর ওই বড়জোর সাত-আট বছর মেয়াদ খাটতে হবে। বেরিয়ে এলেই নগদ পাঁচ লাখ টাকা, বুঝলি?"

নবীন ঘাড় নেড়ে বলল, "বুঝেছি।"

"তোকে তো আমার হিংসেই হচ্ছে রে। এমন সুযোগ যদি আমি পেতুম, তা হলে বর্তে যেতুম। কিন্তু কপাল বটে তোর! কোন ভাগ্যে যে তোর চেহারাখানা হুবহু পল্টুর মতো হল, কে জানে বাবা। আমার যদি তোর মতো একটা ছেলে থাকত, আর পল্টুর মতো দেখতে হত, তা হলে তো কেল্লাই মেরে দিতুম রে।"

নবীনের ইদানীং দিনকাল ভাল যাচ্ছিল না। জমি-বাড়ি বাঁধা,

ধারকর্জও রয়েছে মেলাই, দোকানে বাকিও পড়ে আছে। কাজেই নগেন পাকড়াশির প্রস্তাবটা এল যেন শাপে বর।

দশ হাজার টাকা পেয়ে সে ধারকর্জ কিছু শোধ করে দিল। তারপর শহরে গিয়ে ভাল রেস্টুরেন্টে ঢুকে গান্ডেপিন্ডে মাংস, পোলাও, রাবড়ি আর সন্দেশ সাঁটাল। সাইকেলে করে গাঁ থেকে শহর বার কয়েক চক্কর দিল রোজ। আর ঘনঘন ঘড়ি দেখার কী ঘটা! টাইম দেখে-দেখে আর আশ মেটে না।

মাধবগঞ্জে কুচুটে লোকের অভাব নেই। নবীনের এমন ধাঁ-উন্নতি দেখে অনেকেরই চোখ টাটাল। উমেশ পরামানিক তো একদিন ডেকে দাওয়ায় বসিয়ে ভারী মিষ্টি-মিষ্টি করে বলল, "জানি বাছা, তোর অবস্থা তেমন ভাল নয়। জমি-বাড়ি বাঁধা আছে। তা বলে কি শেষে চুরিতে নাম লেখালি? তোর বাপ শত কষ্টেও তো কোনওদিন অসৎ পথে পা বাড়ায়নি! পীতাম্বর দাসের ছেলে হয়ে তুই কিনা শেষে...?"

মুশকিল হল, লোকের কাছে গোটা ব্যাপারটা তো আর খোলসা করে বলা যায় না। এ যে চুরির জিনিস নয়, রীতিমতো মজুরি, তা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

মনোরঞ্জন চাটুজ্যে একদিন ভারী অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ রে নবে, চাকরি পেয়েছিস নাকি? আজকাল ঘড়ি ধরে চলাফেরা করছিস দেখছি!"

নবীন মরমে মরে গেল। মনোজ্যাঠাকে গুহ্য কথাটা বলা যায় না যে।

হাটখোলার কাছে এক দুপুরে তাকে ধরল ল্যাংড়া মানিক। একখানা লম্বা লাঠি আচমকা তার চলন্ত সাইকেলের চাকায় ঢুকিয়ে দিতেই সে সাইকেল উলটে চিৎপটাং। মানিক মস্তান একটু খুঁড়িয়ে এসে তার গলায় একখানা গামছা পেঁচিয়ে ফাঁস দিয়ে দাঁড় করিয়ে



বলল, "এই যে চাঁদবদন, বলো তো বাপু, টু পাইস আসছে কোথা থেকে?"

গরিবের দুটো পয়সা হলে কেন যে লোকের চোখ টাটায়, তা কে জানে বাবা। নবীন চিঁ চিঁ করে বলল, "খেটেখুটে ন্যায্য রোজগারে কেনা মশাই, চুরি-ডাকাতির জিনিস নয়।"

"বটে!" বলে মানিক তার পকেট হাতড়ে শত খানেক টাকা পেয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "রোজগারপাতি তো খুব ভাল জিনিস রে! মাঝে-মাঝে একটু পেন্নামি দিয়ে যাস, তা হলে আর কেউ কোনও কথা তুলবে না। যাঃ, তোকে আজকের মতো ছেড়ে দিলুম।"

শুধু এতেই শেষ নয়। এক রাত্তিরে খুব বৃষ্টি নেমেছে। ঠান্ডা পেয়ে নবীন নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিল নিজের ঘরে। হঠাৎ দমকা হাওয়া গায়ে লাগায় ঘুমের চটকা ভেঙে যেতেই সে দেখতে পেল, ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা, হাওয়ায় কপাট দুটো আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। আর-একটা লোক তার সাইকেলখানা নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিপদ বুঝে নবীন লাফ দিয়ে পড়ে লোকটাকে সাপটে ধরল। লোকটা একটা মোচড় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সাইকেলখানা ফেলেই পালিয়ে গেল।

নবীনের আর ঘুম হল না। বাকি রাতটুকু বসে ভাবল, এরকম হলে সে বড় বেকায়দায় পড়ে যাবে। টাকাপয়সা বা জিনিসপত্র সামলে রাখার বিদ্যে তার জানা নেই। সুতরাং বড়লোক হলেও তার সবই অন্যেরা কেড়েকুড়ে নেবে।

মনস্থির করে সে সকালেই গিয়ে নগেন পাকড়াশির গদিতে হাজির হয়ে সাইকেল, ঘড়ি, জুতো আর খরচ না-হওয়া সাতশো সাতান্ন টাকা ফেরত দিয়ে বলল, "কাজটা আমি পারব না কর্তা। টাকার গন্ধ পেয়েই চারদিকে নানা কথা উঠছে, অত্যাচারও শুরু হয়েছে। আমাকে আপনি রেহাই দিন।"

একথা শুনে নগেন আর্তনাদ করে উঠল, "পারবি না মানে! সব বন্দোবস্ত যে করে ফেলেছি! কম টাকা গচ্চা যাচ্ছে আমার! ছেলেটা মাথা গরম করে দু'-দুটো খুন করে ফেলায় হয়রানির চূড়ান্ত। তার মধ্যে তুই এখন ব্যাক মারছিস!"

নগেনের পোষা গুন্ডাদের সর্দার হল চণ্ডীচরণ। তার পেল্লায় চেহারা। ক্যাঁক করে এসে নবীনের ঘাড়টা ধরে নেংটি ইঁদুরের মতো শূন্যে ঝুলিয়ে বলল, "একটা রদ্দায় মাথা ভেঙে দিতে পারি, তা জানিস?"

নবীনের দম বন্ধ হয়ে চোখ উলটে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়।

নগেন ফের আর্তনাদ করে উঠে বলল, "ওরে, ছেড়ে দে, ওকে ভড়কে দিসনি। তোতাই-পাতাই করে রাজি না করালে হবে না বাপু। ও বিগড়ে গেলে যে পল্টুর প্রাণ সংশয়!"

চণ্ডীচরণ তাকে ছেড়ে তো দিলই, তারপর তাকে খাতির করে চেয়ারে বসিয়ে ময়রার দোকান থেকে গরমাগরম কচুরি আর জিলিপি আনিয়ে খাওয়ানো হল।

নগেন পাকড়াশি একটা বড়সড় চটের থলি তার হাতে দিয়ে বলল, "এই নে বাপু, পুরো পাঁচ লাখ আছে। সাবধানে রাখিস, খোয়া-টোয়া না যায়। নামে চোদ্দো বছর, আসলে সাত-আট বছরের বেশি তো নয় রে। তা সাত-আট বছর পর তোর বয়স হবে মেরে-কেটে তিরিশ। বাকি জীবনটা পায়ের উপর পা তুলে আরামে কাটিয়ে দিতে পারবি। এখন যা, আমার পাইকরা তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

পাঁচ লাখ টাকা পেয়ে নবীন যেন কেমনধারা ভোম্বল হয়ে গেল। এত টাকা! তাদের সাত পুরুষেও কেউ এত টাকা চোখে দেখেনি। কিন্তু টাকাটা কোথায় গচ্ছিত রেখে যাবে, সেইটেই ভেবে পাচ্ছিল না নবীন।

তার পাড়াতুতো এক পিসি আছে, ননীবালা। তিরানব্বই বছর বয়স এবং নবীনের মতোই তারও তিন কুলে কেউ নেই। আর সেইজন্যই বুড়ি একটু নবীনের ডাক-খোঁজ করে, মোয়াটা, নাড়ুটা খাওয়ায়। টাকার পোঁটলা নিয়ে নবীন যখন এক দুপুরবেলা ননীপিসির কাছে হাজির হল, তখন প্রস্তাব শুনে পিসির মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। বলল, "বলিস কী বাছা! এই ভাঙা ঘরে থাকি, ও টাকা আমি কোথায় লুকোব? তারপর সাত-আট বছরের কথা বলছিস, ততদিন কি আমি বাঁচব রে? তা বাপু, ও টাকা পেলি কোথায়? চুরি-ডাকাতির টাকা নয় তো!"

"না পিসি, ন্যায্য টাকা। পরে সব বুঝিয়ে বলব।"

এর পর সাইকেল আর ঘড়ি বেচে দিল নবীন। সেই টাকায় আরও ভালমন্দ খেল, নতুন জামা কিনল একটা, দীনদুঃখীদের কিছু দিল-থুল। দানধ্যান তো জীবনে করার ফুরসত পায়নি।

তারপর এক ঝড়-জলের রাতে বন্দোবস্ত মতো নগেনের পাইকরা তাকে নিয়ে গিয়ে জেলের ফটকের কাছে হাজির করল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেপাইরা তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে নানা চোরা পথ পার হয়ে একটা গরাদওয়ালা খুপরি ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিল।

জেলখানা জায়গাটা খুব একটা খারাপও লাগছিল না নবীনের। খেতে-টেতে দেয়, শোওয়ার জন্য কম্বল আছে, মাথার উপর ছাদ, আর চাই কী? কিন্তু দু'-চার দিনের মধ্যেই সে কানাঘুষো শুনতে পেল যে, যাবজ্জীবন নয়, সে আসলে ফাঁসির আসামি। কেস নাকি এখন হাইকোর্টে, যে-কোনও দিন রায় বেরোবে।

এই খবরে নবীনের চুল খাড়া হয়ে উঠল। সর্বনাশ! নগেন পাকড়াশি তো সাংঘাতিক লোক! পল্টুর যে ফাঁসির হুকুম হয়েছে, এটা তো সে নবীনকে বলেনি! শুনে সে খুব চেঁচামেচি শুরু করে



দিল, "ওগো, তোমরা সবাই শোনো! আমি কিন্তু পল্টু নই। আমি হলুম নবীন দাস। মাধবগঞ্জের পীতাম্বর দাসের ছেলে।"

তার চেঁচামেচিকে কেউ পাত্তাই দিল না। শুধু মোটামতো একজন সেপাই এসে খুব ভালমানুষের মতো বলল, "ফাঁসির হুকুম হলে অনেকেরই তোমার মতো হয়। তবে ভয় খেয়ো না, ভাল করে খাও-দাও। ফাঁসি যখন হবে, তখন হবে। ভেবে লাভ কী?"

শুনে নবীন তার খুপরিতে বসে বিস্তর কান্নাকাটি করল। লোভে পড়ে নিজের প্রাণটাকে এরকম উচ্ছুঙ্খল করাটা কি ঠিক হল তার? নগেনের কথায় বিশ্বাস করাটাও তার ভারী আহাম্মকি হয়েছে।

তার খাওয়া কমে গেল। ঘুম হতে চায় না। শরীর দুর্বল লাগে। মাথা ঝিমঝিম করে।

জেলে যাওয়ার মাসছয়েক বাদে হঠাৎ একদিন সকালে এক উকিলবাবু এলেন। তাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল নবীন। মনোমাস্টারের ছেলে শিবুদাদা। কয়েক বছর আগেও মনোরঞ্জন মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি দুধ দোয়াতে গিয়েছে নবীন। তখন মনোমাস্টার তাকে পড়াত।

"শিবুদাদা! আমি নবীন!"

শিবপদ উকিল অবাক চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, "তাই তো রে! থানার এক সেপাই আমাকে ক'দিন আগে চুপিচুপি খবর দিয়েছিল বটে, আসামি অদলবদল হয়েছে! তখন বিশ্বাস হয়নি। এখন তো দেখছি, ঠিকই শুনেছি। ব্যাপারটা কী বল তো!"

নবীন হাউমাউ করে খানিক কেঁদে, খানিক ককিয়ে গোটা ঘটনাটা বলে গেল।

শিবপদ চিন্তিত মুখে বলল, "সর্বনাশ করেছিস। এখন যদি প্রমাণও হয় যে, তুই পল্টু নোস, তা হলে বিস্তর হ্যাপা আছে। সরকার এবং আদালতকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তোর নামে মামলা

হবে। আসামি বদলের জন্য জেলারসাহেবের চাকরি যাবে। তার উপর পল্টুর নামে হুলিয়া জারি হবে।”

“তা হলে আমার কী হবে শিবুদাদা?”

“দাঁড়া, ব্যাপারটা সহজ নয়। খুব ভাল করে উপায় ভাবতে হবে।”

কয়েকদিন উৎকণ্ঠায় থাকার পর একদিন শিবপদ গম্ভীর মুখে এসে বলল, “একটা উপায় হয়েছে। তোকে জেল থেকে পালাতে হবে।”

চোখ বড় বড় করে নবীন বলল, “কী করে পালাব শিবুদাদা? চারদিকে যে পাহারা!”

“সে তোকে ভাবতে হবে না। তোকে পালাতে না দিলে জেলারসাহেব আর তার কর্মচারীদেরও বিপদ। তারাই তোকে পালাতে দেবে।”

একগাল হেসে নবীন বলে, “তা হলে তো বড্ড ভালই হয়।”

শিবপদ মাথা নেড়ে বলল, “না, হয় না। তুই পালালেও তোর বিপদ কাটবে না। পুলিশ তোকে খুঁজবে না ঠিকই, কিন্তু নগেন পাকড়াশি ছাড়ার পাত্র নয়। কারণ, তুই পালালে পুলিশ এখন হন্যে হয়ে পল্টুকে খুঁজবে। আর নগেনের উপর উৎপাত বাড়বে। কাজেই ছাড়া পেলে গা ঢাকা দিয়ে থাকিস। খবরদার, নিজের বাড়ি বা গাঁয়ের ধারে-কাছে যাস না।”

আবার এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে পুলিশ তাকে ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে একটা জঙ্গলের ধারে নামিয়ে দিল। বলল, “পালা বাপু। প্রাণপণে দৌড়ো। একটু পরে আমরা কিন্তু পিছন থেকে গুলি চালাব। লেগে গেলে দোষ নেই কিন্তু।”

এমন দৌড় নবীন জীবনে দেয়নি। অন্ধকারে গাছপালা ভেদ করে সে কী ছুট! পিছনে চার-পাঁচবার গুলির শব্দও হয়েছিল ঠিকই। ঝড়,

বাদলা, অন্ধকার আর জঙ্গল সব মিলিয়ে সে এক অশৈলী অবস্থা। নবীন কতবার যে আছড়ে পড়ল, আর গাছে-গাছে ধাক্কা খেল, তার হিসেব নেই। কিন্তু প্রাণের ভয়ের চেয়ে বড় ভয় আর কী আছে! জঙ্গলটা শেষ হওয়ার মুখে একটা খালের জলে গিয়ে পড়ল নবীন। সাঁতরে খাল পেরিয়ে একটা ফাঁকা ঘাট। তারপর ফের জঙ্গল। নিশুত রাতে জলে ঝুব্বুস ভিজে সে যখন কাঁপছে, পা আর চলছে না, তখন একটা বাড়ির হদিশ পাওয়া গেল। কার বাড়ি, ঢুকলে চোর বলে ঠ্যাঙাবে কি না, সেইসব ভাবার মতো মনের অবস্থা নয়। সে কোনওরকমে বারান্দায় উঠে সামনের দরজায় একটা ধাক্কা দিল। কিন্তু কপাটহীন দরজায় ধাক্কাটা লাগল না, বরং নবীন হড়াস করে ঘরের ভিতরকার মেঝের উপর পড়ে গেল। কোনওরকমে উঠে একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হাঁটু তুলে তাতে মুখ গুঁজে হাঁফাতে লাগল। ক্লান্তিতে শরীর এমন ভেঙে এল যে, ভেজা গায়েই নিঃসাড়ে ঘুমিয়েও পড়ল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও সে টের পাচ্ছিল, এ বাড়ির লোকেরা তার এই আকস্মিক আগমনে মোটেই খুশি হয়নি।

কে যেন বলল, "এটা আবার কে রে?"

কেউ যেন জবাব দিল, "গায়ে তো কয়েদির পোশাক দেখছি।"

একজন বুড়ো মানুষের গলা শোনা গেল, "ও হল ফাঁসির আসামি। নবীন।"

ধরাই পড়ে গেল কি না, সেটা বুঝতে পারল না নবীন। ধরা পড়লে আবার হয়তো হাজতেই নিয়ে যাবে তাকে। ফাঁসিও হতে পারে। এত খেটেখুটেও লাভ হল না তেমন। তবে শরীরটা ক্লান্তিতে বস্তার মতো ভারী হয়ে আছে বলে ভয়ডরও তেমন কাজ করল না। সে কাত হয়ে মেঝেয় শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই নবীন ভারী বুরবক হয়ে গেল। সে একটা পোড়ো বাড়ির ভাঙাচোরা ঘরে ধুলোময়লার মধ্যে পড়ে

আছে। চারদিকে ডাঁই হয়ে আছে আবর্জনা। এ বাড়িতে বহুকাল মানুষের বাস নেই। তবে কি ঘুমের মধ্যে সে ভুলভাল কথাবার্তা শুনেছে? তাই হবে। স্বপ্নই দেখে থাকবে হয়তো। এটা কোন জায়গা, তা তার জানা নেই। কাছেপিঠে লোকালয় আছে কি না, কে জানে। সবচেয়ে বড় কথা, খিদে চাগাড় দিচ্ছে, আর পকেটে পয়সা নেই।



আড়ে-দিঘে অষ্টপুর খুব একটা বড় জায়গা নয়, বিখ্যাতও নয় তেমন। তা অষ্টপুরে দ্রষ্টব্য জায়গা কিছু কম নেই। বিন্ধ্যেশ্বরীর মন্দিরের লাগোয়া দ্বাদশ শিবের থান আছে। পুব দিকে উজিয়ে গেলে দয়াল সরোবর। এত বড় দিঘি দশটা গাঁ ঘুরে পাওয়া যাবে না। দিঘি পেরোলে বাঁ হাতে নীলকুঠির মাঠ, তারপর জঙ্গলের মধ্যে ফস্টারসাহেবের ভুতুড়ে বাড়ি। ওদিকটায় না যাওয়াই ভাল। সাপখোপ আছে। আর এখানকার ভূত খুব বিখ্যাত। ডান ধারে সিট্‌লসাহেবের গির্জা। এখন আর এই অঞ্চলে খ্রিস্টান কেউ নেই বটে, কিন্তু হরেন চাটুজ্যের মা রোজ সন্ধেবেলা এসে গির্জায় মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে যিশুবাবাকে প্রণাম করে যান। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলেন, "আহা, যিশুবাবা বড় কষ্ট পেয়েছিল গো! ভাবলে আজও আমার চোখে জল আসে যে!"

গির্জা পেরিয়ে ডানহাতি রাস্তা ধরে সোজা এগোলে মহারাজ বীরেন্দ্রনারায়ণের ভাঙা প্রাসাদটা ডান হাতে পড়বে। রাজবংশের কেউ না থাকলেও ফটকের পাশে একটা খুপরি ঘরে বুড়ো ফাগুলাল আজও আছে। রাজবাড়ির পরেই মোস্তাফার হাট। এ হাটের খুব

নামডাক। প্রতি মঙ্গলবারে বিশাল হাট বসে যায়। মোস্তাফার হাটের ধারেই মন্তেশ্বরীর খাল। খালধার দিয়ে ডানহাতি ঘুরে একটু এগোলেই থানা। থানা পেরিয়ে চণ্ডীমণ্ডপ, তারপর বিখ্যাত বটতলার চত্বর, যেখানে দোকানপাট আছে, চা আর নানখাটাই বিস্কুট পাওয়া যায়। বটতলা পেরিয়ে মসজিদ। ফের ডান দিকে ফিরলে দুর্গামণ্ডপ, প্রগতি ক্লাব, স্কুল, খেলার মাঠ। সুতরাং অষ্টপুর খুব একটা ফ্যালনা জায়গা নয়।

কয়েকদিন বর্ষাবাদলার পর আজ অষ্টপুরে রাঙা রোদ উঠেছে। আবহাওয়া অতি মনোরম। গাছে-গাছে পাখি ডাকছে। তার সঙ্গে গোরুর হাম্বা, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, বেড়ালের ম্যাও সবই যথোচিত শোনা যাচ্ছে। অষ্টপুরের মানুষজন অনেকেই বিষয়কর্মে বেরিয়ে পড়েছেন, কেউ কেউ দাঁতন করছেন বা ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজছেন, কেউ বা পুজো-আহ্নিকে বসেছেন, কেউ বাজারে গিয়ে সবজি বা মাছ কিনছেন, বটতলায় চায়ের দোকানে বেশ জটলা হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে অষ্টপুরের জীবনযাত্রা বেশ স্বাভাবিকই বলা যায়।

জঙ্গল থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছিল না নবীন। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে পড়ে গিয়ে আর গাছে ধাক্কা খেয়ে তার মুখ, কপাল, হাত সব ক্ষতবিক্ষত। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কালশিটে পড়েছে। তার গায়ে এখনও কয়েদির পোশাক। লোকে লহমায় ধরে ফেলবে যে, সে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। লোকালয়ে যেতে হলে তার একটা চলনসই পোশাক চাই। তারপর প্রাণে বাঁচতে দরকার একটু দানাপানির। নবীন জীবনে কখনও চুরিটুরি করেনি, ভিক্ষে করার অভ্যেসও নেই। কী করবে, তা সে ভেবে পাচ্ছিল না।

জঙ্গলের আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে সে জায়গাটা একটু আঁচ করার চেষ্টা করছিল। গাঁয়ের নাম তার জানা নেই বটে, কিন্তু বেশ

একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। বেশ পছন্দসই জায়গা।

বুদ্ধি তার কোনওদিনই বিশেষ নেই। তবু সে একটা গাছের তলায় বসে খুব মন দিয়ে ফন্দি আঁটার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল, রাস্তার উলটো দিকে যে পুরনো গির্জাটা আছে, সেটায় বোধ হয় এখন কোনও লোকজন নেই। বড় দরজাটায় কোনও তালাটালাও দেখা যাচ্ছে না। সে উঁকি দিয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে দুই লাফে রাস্তাটা ডিঙিয়ে গির্জার দরজাটা সাবধানে ফাঁক করল। তারপরেই চমকে উঠে দেখতে পেল, একজন বুড়ো মানুষ একটা লম্বা ডাঁটিতে লাগানো ব্রাশের মতো জিনিস দিয়ে ভিতরের মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে। টপ করে দরজাটা ভেজিয়ে দিল নবীন। আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেত।

ফের জঙ্গলের মধ্যে এসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল সে। এভাবে চুপচাপ বসে থাকলে সে যে বাঁচবে না, এটা স্পষ্টই বুঝতে পারছিল নবীন। সাহস করে কিছু একটা করতেই হবে। এমনকী, চুরিও।

জঙ্গলের আড়ালটা বজায় রেখেই সে খানিকটা এগিয়ে গেল। সামনে একটা বিশাল দিঘি, তাতে টলটলে জল। এদিকটায় লোকজনও নেই। নবীন দিঘির ধারে নেমে আঁজলা করে তুলে অনেকটা জল খেয়ে নিল। জলে খানিকটা কাজ হয় বটে, তবে বেশিক্ষণ জল খেয়ে থাকা যাবে না।

নবীন একটু দম নিয়ে সাহস করে জঙ্গল ছেড়ে বাড়িঘরের পিছনবাগে গা ঢাকা দিয়ে গাঁয়ের দোকানপাটের সন্ধানে এগোতে লাগল। যেখানে মেলা লোকের ভিড়, সেখানে মিলেমিশে গেলে হয়তো তার পোশাকটা লোকের তেমন চোখে পড়বে না।

কপালটা তার ভালই। বেশ একটা জমজমাট চত্বরের কাছেপিঠে সহজেই হাজির হয়ে গেল সে। প্রকাশ্যে বেরোতে অবশ্য সাহস

হল না। একখানা খেজুর গাছের আবডালে কিছু ঝোপঝাড় দেখে সেখানেই গা ঢাকা দিয়ে নজর রাখতে লাগল। সামনেই একটা চাতালে বাজার বসেছে। রাস্তার দু' ধারে বেশ কয়েকটা দোকান। জামাকাপড়, খাবার, স্টেশনারি জিনিস সবই পাওয়া যায়। পয়সা থাকলেই হল। আর নবীনের পয়সাটাই নেই। মাধবগঞ্জের পিসির কাছে তার পাঁচ লাখ টাকা গচ্ছিত আছে বটে, কিন্তু থেকেও নেই। এখন মনে হচ্ছে, ওটা একটা রূপকথার গল্প ছিল।

একজন বেশ ফর্সা, স্বাস্থ্যবান, গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা লোক একটা ঝকঝকে সাইকেলে চেপে এসে চত্বরে নামল।

লোকটার হাবভাব ভারী বেপরোয়া। তালা না লাগিয়েই সাইকেলখানা বটতলার ছায়ায়, স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে বাজার করতে ঢুকে গেল। পয়সা আছে বটে লোকটার। দরদাম না করেই একজোড়া ইলিশ কিনে ফিলল, দু' কেজি পাঁঠার মাংস, এক কুড়ি কই মাছ, মিষ্টির দোকান থেকে এক হাঁড়ি দই আর দু' বাক্স মিষ্টি। একটা কুলি গোছের লোকের হাতে বাজারের জিনিসগুলো গছিয়ে রওনা করিয়ে দিয়ে লোকটা চায়ের দোকানে চা খেতে বসল। তারপর চায়ের দাম মেটাতে মানিব্যাগটা যখন বের করেছে, তখনই বোধ হয় বটগাছ থেকে একটা বেরসিক কাক বড়-বাইরে করে দিল লোকটার পাঞ্জাবিতে। লোকটা ভারী বিরক্ত হয়ে একবার উপর দিকে চেয়ে শশব্যস্তে ছুটে গেল কাছের টিউবওয়েলে পাঞ্জাবি ধুতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মানিব্যাগটা পড়ে রইল বেঞ্চের উপরেই। আর এমনই কপাল নবীনের যে, সে যেখানে লুকিয়ে আছে, তার মাত্র সাত-আট ফুট দূরেই মানিব্যাগটা। দোকানে খদ্দের নেই। দোকানিও অন্য কাজে ব্যস্ত। নবীনের মনে হল, এ একেবারে ভগবানের দান। এ সুযোগ ছাড়া মহাপাপ।

আর যাই হোক, নবীনের একটা গুণ স্বীকার করতেই হয়। সে

হরিণের মতো দৌড়তে পারে। বুকটা যদিও কাঁপছিল, জীবনে কখনও চুরিটুরি করেনি বলে মনটাও আড় হয়ে আছে। তবু সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে নবীন দুই লম্ফে অকুস্থলে পৌঁছে মানিব্যাগটা খপ করে তুলে নিয়েই আবার হরিণপায়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। মানিব্যাগটা সঙ্গে রাখা বোকামি। সে তাড়াতাড়ি টাকাগুলো বের করে নিয়ে ব্যাগটা ফেলে দে দৌড়।

কথা হচ্ছে, সব ঘটনার আগেও ঘটনা থাকে, পরেও ঘটনা থাকে। এই অবনী ঘোষালের কথাই বলছিলাম আর কী। অবনী ঘোষাল অতিশয় হুঁশিয়ার লোক। জীবনে তার কখনও পকেটমারি হয়নি, বাড়িতে চোর ঢোকেনি, মন্দিরে জুতো চুরি যায়নি, কেউ তাকে কখনও ঠকাতেও পারেনি। অবনী সর্বদা সজাগ, চারদিকে চোখ, ঘুম খুব পাতলা, হিসেব-নিকেশের মাথা চমৎকার। দ্বিরাগমনে অষ্টপুরের শ্বশুরবাড়িতে এসেছে অবনী। রাত্রিবেলা খাওয়ার সময় অবনীর শ্বশুর শ্রীনিবাস আচার্যি কথায় কথায় বললেন, "বাবাজীবন, অষ্টপুর বড় চোর-ছ্যাঁচোড়ের জায়গা, রাস্তাঘাটে একটু খেয়াল রেখে চোলো। রাত্তিরে সজাগ থেকো।"

শুনে অবনী প্রায় অট্টহাসি হাসে আর কী। গম্ভীর ভাবে বলেছিল, "সেইসব চোর-বাটপাড় এখনও মায়ের পেটে।"

প্রথম রাত্তিরেই আড়াই হাজার টাকাসমেত তার মানিব্যাগটা বালিশের তলা থেকে হাওয়া, কবজি থেকে হাতঘড়ি আর ডান হাতের অনামিকা থেকে পোখরাজের আংটি উধাও, খাটের নীচ থেকে সুটকেস নিরুদ্দেশ, হ্যাঙারে ঝোলানো আদ্দির পাঞ্জাবি থেকে সোনার বোতাম লোপাট।

কাণ্ড দেখে অবনী রাগে গরগর করতে লাগল, আক্রোশে ফুঁসতে লাগল, প্রতিশোধস্পৃহায় দাঁত কড়মড় করতে লাগল। অষ্টপুরের চোরেদের সে পারলে চিবিয়ে খায়। তবু এখানেই শেষ

নয়। সকালে বাজার করতে বেরিয়ে জীবনে প্রথম পকেটমারি হল তার এবং শীতলামন্দিরে প্রণাম করার সময় নতুন চপ্পলজোড়া হাপিশ।

বৃত্তান্ত এখানেই শেষ নয়। শ্যালকের নতুন সাইকেলখানা নিয়ে থানায় এজাহার দিতে যাওয়ার সময় পাশের বাড়ির যদুবাবুকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে সাইকেল থেকে নেমে অষ্টপুরের চোরেদের আদ্যশ্রাদ্ধ করছিল অবনী। সাইকেলখানার হ্যান্ডেল তার ডান হাতে শক্ত মুঠিতে ধরা। কথা শেষ করে পিছন ফিরে দেখে, সাইকেল উবে গিয়েছে, তার ডান হাতে হ্যান্ডেলের বদলে একটা মোমবাতি গুঁজে রেখে গিয়েছে কেউ।

শ্বশুরবাড়ির দেশে এসে এরকম আহাম্মক আর হাস্যাস্পদ হয়ে অবনী জ্বলে উঠল। ঠিক করল, এর একটা বিহিত না করলেই নয়। চোরদের উচিত শিক্ষা না দিয়ে সে ছাড়ছে না। সুতরাং গত তিন দিন যাবৎ সে শ' পাঁচেক করে ডন বৈঠক দিয়েছে, মনের একাগ্রতা বাড়ানোর জন্য ধ্যান, অনুভূতির সূক্ষ্মতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণায়াম এবং আহারশুদ্ধির জন্য হবিষ্যি পর্যন্ত করেছে।

আজ সকালে উঠে তার মনে হয়েছে, হ্যাঁ, সে প্রস্তুত। শরীর হালকা লাগছে, বিশ ফুট দূরে একটা পেয়ারা গাছের মগডালে একটা ছোট্ট পিঁপড়েকেও ঠাহর করতে পারল সে। আলসে দিয়ে যে বেড়ালটা হেঁটে গেল, তার পায়ের শব্দ টের পেতে তার বিশেষ অসুবিধে হল না। এমনকী, নাকের ডগায় একটা মশা বসেছিল বলে সেটাকে মারতে যেই হাত তুলেছে, অমনি স্পষ্ট দেখতে পেল, মশাটা হাতজোড় করে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, "ভুল হয়ে গিয়েছে স্যার, এবারকার মতো ছেড়ে দিন।"

গায়ের জোরের পরীক্ষাতেও সে কম গেল না। একটা ঝুনো নারকোল কিল মেরে ফাটিয়ে দিল, কুয়োর দড়ি দু' হাতে টেনে

ডিমসুতোর মতো ছিঁড়ে ফেলল, লোহার শাবল তুলে হাঁটুতে রেখে চাড় দিয়ে বেঁকিয়ে ফেলল।

তারপর গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে, মানিব্যাগে হাজার কয়েক টাকা নিয়ে, মা কালীকে প্রণাম করে বাজারে বেরোল। চোখ চারদিকে ঘুরছে, ছ'টা ইন্দ্রিয়ই সজাগ, শব্দ-দৃশ্য-গন্ধ সব টের পাচ্ছে এবং বাজারের কাছ বরাবর গিয়ে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্পষ্টই জানান দিতে লাগল যে, চোরটা কাছেপিঠেই ঘাপটি মেরে আছে।

চোরটাকে খেলিয়ে তোলার জন্যই সে আজ ফসফস করে টাকা খরচ করল। তারপর চায়ের দোকানে বসে একটু ছোট্ট অভিনয় করতে হল। তার পাঞ্জাবিতে মোটেই কোনও কাক বড়-বাইরে করেনি। তবু সে মানিব্যাগটা বেখেয়ালে বেঞ্চের উপর রেখে পাঞ্জাবি ধুতে টিউবওয়েলে যেতেই চোরটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

নবীন দৌড়ে সবে দিঘিটার দিকে বাঁক নিয়েছে, অমনি কে যেন ক্যাঁক করে তার ঘাড় ধরে নেংটি ইঁদুরের মতো শূন্যে তুলে ফেলল। তারপর ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, "তা হলে তুমিই সেই ওস্তাদ, অ্যাঁ!"

নবীনের মুখে বাক্য নেই। শরীর দুর্বল, খিদে-তেষ্টায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে তাকে বাজারের চাতালে এনে ফেলল অবনী ঘোষাল। হাঁক মেরে বলল, "এই যে তোমাদের অষ্টপুরের ওস্তাদ চোরকে ধরেছি। এখন এর ব্যবস্থা তোমরাই করো। আমার মানিব্যাগ নিয়ে পালাচ্ছিল।"

অষ্টপুরের জামাই অবনী ঘোষালের হেনস্থার কথা গাঁয়ের সবাই জানত। তার জন্য মরমে মরেও ছিল তারা। শত হলেও গাঁয়ের কুটুম। তার হেনস্থায় অষ্টপুরেরই অপমান। সুতরাং চোখের পলকে

বিশ-পঞ্চাশজন লোক জুটে গেল। কারও হাতে বাঁশ, কারও হাতে লাঠি।

তারপর দে মার! দে মার!

খিদের কষ্ট, অভাবের তাড়না থাকলেও জীবনে মারধর বিশেষ খায়নি নবীন। নিরীহ, ভিতু ছেলে সে। ধর্মভয় প্রবল। উপোসি, ক্লান্ত শরীরে হাটুরে মার খাওয়ার ক্ষমতাই ছিল না তার। তাই প্রথম কয়েক ঘা চড়চাপড় আর লাথি-ঘুসি খেয়েই সে অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর আরও অন্তত আধ ঘণ্টা লাঠি আর বাঁশ দিয়ে যে পেটানো হল তাকে, তা আর সে টের পেল না।

মার যখন থামল, তখন নবীনের মুখ আর নাক দিয়ে প্রবল রক্ত গড়াচ্ছে, বাঁ চোখ ফুলে ঢোল, ঠোঁট ফেটে রক্তাক্ত হয়ে আছে। মাথার চুলে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

বটতলার একটু তফাতে একটা কদম গাছের তলায় লুঙ্গি পরা একটা লোক বসে বসে দৃশ্যটা দেখছিল। তার গায়ে একটা পিরান, গালে রুখু দাড়ি, ঝোলা গোঁফ। রোগা ছিপছিপে চেহারার মাঝবয়সি লোকটা দৃশ্যটা দেখে আপনমনেই বিড়বিড় করে বলছিল, "একে আহাম্মক, তার উপর কাঁচা হাত। ওরে বাপু, বিশ-বাইশ বছর বয়সে কি আর কাজে নেমে পড়তে হয়! এ হল শিক্ষার বয়স। হাত পাকতে, বুদ্ধি স্থির হতেই তো কম করে দশটি বছরের ধাক্কা।"

অবনী ঘোষাল একটু তফাতে দাঁড়িয়ে বিজয় গর্বে হাসি-হাসি মুখে দৃশ্যটা দেখছিল। ভিড়ের ভিতর থেকে একজন লোক বলে উঠল, "এঃ, এর যে হয়ে গিয়েছে রে।"

আর একজন উবু হয়ে বসে নাড়ি দেখে বলল, "নাড়ি চলছে কি না বোঝা যাচ্ছে না বাপু।"

ভিড়টা সঙ্গে সঙ্গে পাতলা হয়ে যেতে লাগল।

লুঙ্গি পরা লোকটা এবার উঠে চায়ের দোকান থেকে এক

ঘটি জল নিয়ে এসে নবীনের মুখে-চোখে একটু ঝাপটা দিয়ে ফের বিড়বিড় করে বলল, "পেটের দায় তো বুঝি রে বাপু, কিন্তু আগুপিছুও ভাববি তো। প্রাণটা গেলে আর মানুষের থাকে কী! দেহখানা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে নেই। বিদ্যের আধার, প্রাণের আধার, ভগবানেরও বাস। দেহ কি ফ্যালনা রে!"



এতদিনে সকলেই জেনে গিয়েছে যে, প্রাণপতি খাসনবিশ একজন আলাভোলা মানুষ। তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম এ এবং এম ফিল। মুন্ডু এবং ধড়কে যদি আলাদা ভাবে বিচার করা যায়, তা হলে দেখা যাবে, প্রাণপতিবাবুর মুন্ডুটা সর্বদাই নানা রকম দার্শনিক চিন্তায় ডুবে আছে, পৃথিবীটা কি আছে না নেই, সামনের ওই দেওয়ালটা কি সত্যি না মিথ্যে, অস্তিত্ব ব্যাপারটা কি মায়া না মতিভ্রম! আচ্ছা, ওই যে মেটে কলসি করে মেয়েটা জল আনছে, ওই মেটে কলসিটা আসলে কী? মৃৎপাত্র? না, মৃৎপাত্র তো অনেক রকমের হয়। তা হলে কলসি বলতে শুধু মৃৎপাত্র বললে তো হবে না। গোলাকার মৃৎপাত্র? উঁহু, তাতেও পুরো বোঝা যাবে না। জল রাখার জন্য গোলাকার মৃৎপাত্র? উঁহু, ওতেও গণ্ডগোল রয়ে গেল!

এইরকম নানা গুরুতর চিন্তায় তাঁর মাথা সর্বদা ব্যাপৃত থাকে। আর থাকে বলেই নিজের ধড়টাকে তাঁর সব সময় খেয়াল থাকে না। আর থাকে না বলেই মাঝে-মাঝে নীচের দিকে তাকিয়ে তিনি ভারী অবাক হয়ে যান। কারণ মুন্ডুর নীচে, অর্থাৎ ঘাড়ের তলা থেকে তাঁর পরনে পুলিশের পোশাক, কোমরে চওড়া বেল্ট ও ভারী পিস্তল।

প্রাণপতিবাবুর মুন্ডুর সঙ্গে ধড়ের এই খটাখটি বহুকালের। দু' পক্ষের বনিবনা নেই বললেই হয়।

মাঝে-মাঝে তাঁর ফচকে হেড কনস্টেবল ফটিক তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে জানান দেয়, "স্যার, আজ বড্ড উপরে উঠে গিয়েছেন স্যার। আপনার মাথাটা যে গ্যাসবেলুনের মতো নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। এবার একটু নেমে আসুন স্যার।"

প্রাণপতিবাবু তখন নামেন বটে, কিন্তু চারদিককার চুরি, গুন্ডামি, ডাকাতি, খুনজখম, পকেটমারি এসব দেখে ভারী বিরক্ত হন।

আজ সকালের দিকটায় প্রাণপতিবাবু ইনফিনিটি জিনিসটা নিয়ে ভাবছিলেন। ওই ইনফিনিটি বা অসীম ব্যাপারটা কী, তা ভাবতে ভাবতে তাঁর মনপ্রাণ ডানা মেলে একেবারে আকাশে উধাও হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময় তিনি হঠাৎ 'লাশ' শব্দটা শুনতে পেলেন।

কে যেন বেশ হেঁকেই বলল, "স্যার, একটা লাশ এসেছে।"

'লাশ' শব্দটা তিনি জীবনে কখনও শুনেছেন বলে মনে হল না। লাশ! লাশ মানে কী? লাশ কাকে বলে? লাশ দেখতে কেমন?

ফটিক ফের চেঁচাল, "স্যার, একটা লাশ এসেছে।"

ভারী বিরক্ত হয়ে প্রাণপতিবাবু বললেন, "লাশ এসেছে! সেটা তো পুলিশ কেস! এখানে কেন, ওদের থানায় যেতে বলো।"

"আজ্ঞে, এটাই অষ্টপুরের থানা স্যার। আর আপনিই বড়বাবু।"

অনন্ত আকাশের একদম মগডাল থেকে প্রাণপতিবাবু ঝম করে পারিপার্শ্বিকে নেমে এলেন এবং বুঝতে পারলেন, তিনি অষ্টপুর নামে একটা নষ্ট ও ভ্রষ্ট জায়গায় বড় কষ্টে আছেন।

খুব বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, "লাশ! লাশ! কীসের লাশ? কার লাশ?"

ফটিক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই বলল, "আজ্ঞে, মানুষেরই লাশ।"

বাস্তব জগতের সঙ্গে প্রাণপতিবাবুর খটাখটি বহু দিনের। এই বাস্তব জগতে এমন বহু ঘটনা ঘটে, যেগুলোর কোনও অর্থ হয় না, না ঘটলেও চলে যেত, ঘটা উচিত ছিল না। তবু ঘটে। এই যে একটা লাশের কথা তিনি শুনছেন, যদি ঠিক শুনে থাকেন, তা হলে ওই লাশ নিয়ে তাঁকে এখন বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হবে।

অত্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বডিটা কার?"

"নামধাম জানা যায়নি স্যার, তবে গায়ে কয়েদির পোশাক আছে। মনে হয়, সদরের জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছে। একটু আগেই অবনী ঘোষালের পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তারপর হাটুরে কিল খেয়ে অক্কা পেয়েছে।"

"এটা অত্যন্ত অন্যায়।"

ঘটনাক্রমের ভিতর অনেক অন্যায়ের গন্ধ আছে বলে পরিষ্কার থাকার জন্য ফটিক জিজ্ঞেস করল, "কোনটা অন্যায় স্যার?"

"সদরের জেলখানা থেকে পালিয়ে মরার জন্য অষ্টপুর ছাড়া কি আর জায়গা ছিল না লোকটার?"

"সবাই যদি বুদ্ধিমান আর বিবেচক হত, তা হলে তো কথাই ছিল না স্যার।"

ছোট কনস্টেবল বক্রেশ্বরের ধ্যানজ্ঞান হল হোমিয়োপ্যাথি। অবসর সময়ে বসে 'সহজ পারিবারিক চিকিৎসা' বা 'হোমিয়োপ্যাথি শিক্ষা' ইত্যাদি বই পড়ে। সর্বদাই ছোট একখানা কাঠের বাক্স থাকে তার কাছে। মানুষ তো বটেই, গোরু-ছাগলকেও সে হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ খাওয়ায় বলে শোনা গিয়েছে।

বক্রেশ্বর ঘরে ঢুকে একখানা স্যালুট ঠুকে বলল, "মনে হয়, বেঁচেও যেতে পারে স্যার। নাক্স ভোমিকা আর আর্নিকা ঠুসে দিয়েছি। ঘণ্টাখানেক বাদে আরও দুটো ওষুধ দেব। নাড়ি এখনও বসে যায়নি, মাঝে-মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠছে।"

নিজের ভাগ্যের উপর খুব একটা ভরসা নেই প্রাণপতির। ভাগ্য ভাল বা চলনসই হলেও দর্শনশাস্ত্রে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত প্রাণপতির শেষ পর্যন্ত পুলিশের চাকরি জুটত না। আর মুন্ডু ও ধড়ের বিবাদে নিয়ত দ্বিখণ্ডিত হতে হত না তাঁকে। তবু প্রাণপতি মিনমিন করে বললেন, "দেখো, কী হয়।"

বক্রেশ্বরের ওষুধের গুণেই হোক কিংবা প্রাণপতির বিরূপ ভাগ্য হঠাৎ সদয় হওয়াতেই হোক, ঘণ্টাখানেক পরে লাশটার নাড়ি চলতে শুরু করল, শ্বাসপ্রশ্বাসও চালু হল। শশধর ডাক্তার এসে লোকটির ক্ষতস্থানে মলম আর পুলটিস লাগাতে লাগাতে দুঃখ করে বললেন, "ছ্যাঃ ছ্যাঃ, আজকাল কী সব পকেটমার হয়েছে বলুন তো, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়! হ্যাঁ, পকেটমার ছিল বটে আমাদের আমলের কালু বারুই। ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া হাতের গুলি। ফুলবাড়ির দারোগা হেরম্ববাবু তো তাকে গাছে বেঁধে আধবেলা বাঁশপেটা করেছিলেন। তারপর তাঁরই সর্বাঙ্গে ব্যথা। কালু তো হেসেই খুন।"

প্রাণপতিবাবু শশধর ডাক্তারের উপর ভরসা রাখেন না। তাঁর মেয়ের আমাশা শশধর এখনও সারাতে পারেননি। তাঁর ওষুধে কারও কিছু সারে বলেও শোনা যায় না। তবু জিজ্ঞেস করলেন, "অবস্থা কেমন দেখছেন ডাক্তারবাবু?"

"বেঁচে যেতেও পারে। মারা যাওয়াও বিচিত্র নয়। সবই ভগবানের হাত, বুঝলেন তো!"

প্রাণপতি বুঝলেন। বুঝতে তাঁর কোনও অসুবিধেই হল না।

নবীন হামাগুড়ি দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পেরনোর চেষ্টা করছিল। ভারী পিছল সুড়ঙ্গ, তার উপর বেশ চড়াই, কাজটা সহজ নয়। একটু দূরেই অবশ্য সুড়ঙ্গের মুখ দেখা যাচ্ছে। আর পাঁচ-সাতবার হামা টানতে পারলেই পৌঁছে যাবে। আর এখানে পৌঁছে যেতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান। নবীন তাই হাঁচোড়-পাঁচোড় করে যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব শেষ পথটুকু পেরনোর চেষ্টা করছে। পৌঁছেই গিয়েছে প্রায়। আর একটু...

সুড়ঙ্গের মুখে একটা লোক হামাগুড়ির ভঙ্গিতেই খাপ পেতে বসে তাকে জুলজুল করে দেখছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কটা চোখ, তোম্বাপানা মুখ। তার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে বলল, "হাতটা চেপে ধরো হে, টেনে তুলে নিচ্ছি।"

হাঁফাতে হাঁফাতে নবীন খপ করে হাতটা চেপে ধরল। কিন্তু মুশকিল হল, নবীনের পিছন দিকেও একটা টান আছে। লোকটা হেঁইও জোরে টানছে বটে, কিন্তু নবীনকে ঠিক টেনে তুলতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে বলল, "আহা, তোমার কি বেরিয়ে আসার গা নেই নাকি? একটু চাড় মেরে বেরিয়ে আসতে পারছ না?"

নবীন কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "চেষ্টা তো করছি মশাই, কিন্তু কেবল পিছলে নেমে যাচ্ছি যে!"

লোকটা আরও খানিকক্ষণ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, "না হে বাপু, তোমার বেরিয়ে আসার ইচ্ছেটাই নেই। কিন্তু বাপু, ফিরে গিয়ে লাভটা কী বলো তো! সেই তো বিষব্যথার মধ্যে গিয়ে পড়বে। তোমার সর্বাঙ্গে ক'টা কালশিটে জানো? গুনে দেখেছি, দুশো ছাপান্নটা। তিন জায়গায় হাড়ে চিড় ধরেছে। নাক-মুখ-চোখ ফুলে ঢোল, মাথায় দুটো ঢিবি। আর ক্ষতস্থানের তো লেখাজোখা নেই। এক কলসি রক্তপাত হয়েছে, ও শরীরের আর আছেটা কী বলো তো? ফিরে গিয়ে ব্যথা-বেদনায় ককিয়ে মরতে হবে। আর যদি বেঁচেও যাও, ফের গিয়ে ফাঁসিতে লটকাবে। আর যদি ফাঁসি না-ও হয়, তা হলে নগেন পাকড়াশি তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে ভেবেছ? এতক্ষণে বোধ হয় দা, কুডুল নিয়ে বেরিয়েও পড়েছে। তাই তোমার ভালর জন্যই বলছি হে, একটা হেস্তনেস্ত করে উঠে এসো তো বাপু।"

"একটু জিরোতে দিন। তারপর ফের চেষ্টা করছি। কিন্তু আপনি কে?"

"আমি হলুম খগেন দাস, ফস্টারসাহেবের খাজাঞ্চি।"

"ফস্টারসাহেব কে?"

"মস্ত কুঠিয়াল ছিলেন হে। তরোয়াল দিয়ে কত মুন্ডুই যে কেটেছেন!"

"ওরে বাবা!"

"আহা, তোমার ভয় কী? তুমি নাকি ভারী ভাল কবাডি খেলতে পারো?"

একগাল হেসে নবীন বলে, "তা পারি।"

"তবে তো হয়েই গেল। ফস্টারসাহেব কবাডি খেলার পাগল। নাও বাপু, অনেকক্ষণ জিরিয়েছ, এবার হাতটা যেন কষে চেপে ধরো তো! এক ঝটকায় তোমাকে বের করে আনছি!"

তা ধরল নবীন, কষেই ধরল। কিন্তু পিছনের টানটা বড্ড জোর লেগেছে। সে ফের পিছলে নেমে যাচ্ছে নীচে।

খগেন দাস অবশ্য বেশ পালোয়ান লোক। ফের তাকে খানিক টেনে তুলে বলল, "ইচ্ছেশক্তিকে কাজে লাগাও হে, এই অন্তিম মুহূর্তটাই গোলমেলে। চাড় মারো, জোরসে চাড় মারো।"

তা মারছিল নবীন। একটু উপরের দিকে উঠলও যেন!

খগেন বলল, "আর শোনো, খবরদার ওই ঝাড়ুদারটার সঙ্গে ভাব করতে যেয়ো না যেন! খুব খারাপ লোক।"

অবাক হয়ে নবীন বলে, "কে ঝাড়ুদার? কার কথা বলছেন?"

"ওই যে শীতলসাহেবের গির্জা ঝাঁটায় যে লোকটা, ওর নাম পল। একদম পাত্তা দিয়ো না ওকে। ওর মাথার ব্যামো আছে।"

"যে আজ্ঞে, তাই হবে। কিন্তু আমি যে আর পেরে উঠছি না মশাই, আমার পা ধরে কে যেন বেজায় জোরে টানছে।"

"আহা, সে তো টানবেই। ঝটকা মেরে পা ছাড়িয়ে নাও, তারপর উঠে এসো। শরীরটা ছেড়ে গেলেই দেখবে ফুরফুরে আরাম লাগবে।"

কিন্তু নীচের দিকের টানটাই বড্ড বেশি হয়ে উঠল। খগেন দাসের জোরালো মুঠিও ঠিক সামাল দিতে পারল না। হাতটা হড়কে গিয়ে সুড়ঙ্গ বেয়ে সুড়সুড় করে নীচে নামতে লাগল নবীন। তার পর ঝড়াক করে এক জায়গায় থামল। আর থামতেই মনে হল, চারদিক থেকে যেন হাজারটা ভিমরুল হুল দিচ্ছে তাকে। সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা টনটন করছে, গাঁটে-গাঁটে যন্ত্রণার হাট বসে গিয়েছে, কানে ঝিঁঝি ডাকছে, চোখে অন্ধকার দেখছে সে।

খানিকক্ষণ পর নবীন বুঝতে পারল যে, মরতে-মরতেও সে মরেনি। তার হাত-পা অবশ হলেও একটু-আধটু নাড়াচাড়া করতে পারছে। তার গায়ে বোধ হয় খুব জ্বর। বড্ড শীতও করছে তার।

তার মাথাটা তুলে কে যেন তাকে কিছু একটা খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। গরম দুধ নাকি? তাই হবে বোধ হয়। তবে দুধে কেমন একটা স্পিরিট-স্পিরিট গন্ধ।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল নবীন। ঘুমনোর আগে আবছা শুনতে পেল, কে যেন কাকে জিজ্ঞেস করছে, "ছেলেটা কি বাঁচবে?"

"বলা যাচ্ছে না। ইনফেকশন না হলে বেঁচে যেতেও পারে।"

"বেঁচেই বা কী লাভ? শুনছি ফাঁসির আসামি।"

ওই 'ফাঁসির আসামি' কথাটা কানে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল নবীন। কতক্ষণ পর তার ঘুম ভাঙল, কে জানে। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই তার মনে পড়ল, সে ফাঁসির আসামি।

শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা এখন একটু যেন সহ্যের মধ্যে এসেছে। চোখ দুটো পুরো খুলতে পারছে না বটে, কিন্তু সামান্য একটু ফাঁক করতে পারছে। আবছা চোখে সে গরাদের আভাস দেখতে পেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। পালিয়েও লাভ হল না। এরা আবার ধরে এনেছে তাকে। ফাঁসিতেই ঝোলাবে। ভারী হতাশ হয়ে চোখ বুজল নবীন। খগেন দাস ঠিকই বলেছিল, সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই বোধ হয় ভাল হত।

গরাদের ওপাশে কে একজন যেন এসে দাঁড়িয়েছে।

গরাদের ওপাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, সে লম্বা, রোগা, পরনে লুঙ্গি আর গায়ে কামিজ। বয়স চল্লিশের উপর। গালে রুখু দাড়ি আর গোঁফ। জুলজুল করে তাকে দেখছিল।

নবীন চোখ খুলতে লোকটা উবু হয়ে বসে বলল, "কত কাল লাইনে নেমেছ বাপু?"

নবীন হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "নামিনি তো!"

"নামোনি! কিন্তু পষ্ট যে নিজের চোখে তোমার কাণ্ডটা দেখলুম।"

নবীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখে জলও আসছিল তার। আর যাই হোক, তাদের বংশের কারও চোর বদনাম নেই। নবীনই বোধ হয় প্রথম এই কাজ করে ফেলেছিল। এখন তার বড্ড অনুতাপ হচ্ছে। সেই পাপের জন্য এখন যদি তার ফাঁসিই হয়, সেও ভি আচ্ছা। ফাঁসিই হোক।

"ও বাপ! চোখে জল দেখছি! বলি, মরদ মানুষের চোখে জল কেন হে বাপু? কাঁচা কাজ করলে তো কেলেঙ্কারি হবেই। হাত পাকিয়ে তবে না কাজে নামতে হয়।"

"আমি চোর নই। হাত পাকানোরও দরকার নেই। আপনি যান।"

লোকটা তার দিকে আরও কিছুক্ষণ জুলজুলে চোখে চেয়ে থেকে বলে, "চোর নও? তবে গায়ে কয়েদির পোশাক কেন?"

"সে অনেক কথা। আমি ফাঁসির আসামি।"

"বাবা। তবে তো শাহেনশা লোক হে। ক'টা খুন করেছ?"

"একটাও না।"

"বটে? তা হলে ফাঁসি হচ্ছে কোন সুবাদে?"

"সে আপনি বুঝবেন না। কপাল খারাপ হলে কত কী হয়! কিন্তু আপনি কে বলুন তো?"

"আমার নাম উদ্ধব খটিক। সেদিন তোমার কাণ্ড দেখে ভেবেছিলুম, সুযোগ পেলে তোমাকে একটু তালিম দেব, কিন্তু এখন দেখছি সবাইকে দিয়ে সব কাজ হওয়ার নয়। চোর, বাটপাড়, খুনে, গুন্ডা-বদমাশ আমি বিস্তর দেখেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে কোনওটাই মনে হচ্ছে না। যাক গে, তোমার গায়ের বিষ আগে মরুক, তারপর তোমার ঘটনাটা শোনা যাবে।"

উদ্ধব খটিক চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

কে যেন জিজ্ঞেস করছিল, "বড়বাবু কি বাড়িতে আছেন? বড়বাবু কি বাড়িতে আছেন?"

প্রাণপতি খাসনবিশ কথাটার অর্থ কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। কে বড়বাবু, কেনই বা তিনি বাড়িতে থাকতে যাবেন, এসব তাঁর কাছে হেঁয়ালি বলেই মনে হচ্ছিল। সামনে কে একটা আবছা মতো দাঁড়িয়েও আছে বটে, কিন্তু সেটা অলীক বা কুহেলিকাও হতে পারে।

কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবারও একই প্রশ্ন বারবার হাতুড়ির মতো তাঁর কানে এসে পড়ায় হঠাৎ তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন। তাই তো! প্রশ্নটা তো তাঁকেই করা হচ্ছে বটে! এবং তিনিই তো অষ্টপুর থানার বড়বাবু বটে!

তিনি শশব্যস্তে সোজা সটান হয়ে বসে চারদিকটা ভাল করে

দেখে নিয়ে বললেন, “না না, আমি এখন বাড়িতে নেই তো! আমি তো থানায় বসে আছি বলেই মনে হচ্ছে।”

সামনের চেয়ারে বসা একটা লোক হেসে বলল, “যে আজ্ঞে, আপনি থানাতেই বসে আছেন। আপনি নিজের মধ্যে আছেন কি না, সেটাই জানতে চাইছিলাম।”

লোকটা অবনী ঘোষাল, শ্রীনিবাস আচার্যির ছোট জামাই এবং এই লোকটাই যত নষ্টের গোড়া। পল্টু পাকড়াশিকে গণধোলাই দেওয়ানোর মূলে ছিল এরই প্ররোচনা। আর তার ফলেই খুনের আসামিটাকে নিয়ে প্রাণপতিকে ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে। এই মরে কি সেই মরে।

মুখে খাতির দেখিয়ে প্রাণপতি বললেন, “অবনীবাবু যে, বসুন, বসুন।”

অবনী গম্ভীর মুখে বলে, “আমি তো বসেই আছি।”

“ওঃ, তাই তো! হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন?”

“এখনও বলিনি। তবে বলতেই আসা। আপনি কি জানেন, সরকার বাহাদুর ওই মারাত্মক খুনি আর ফেরারি আসামিকে ধরার জন্য কোনও পুরস্কার ঘোষণা করেছে কি না।”

“আজ্ঞে না, এখনও ঘোষণা হয়নি।”

“হবে বলে কি মনে হয়?”

“তা হতেও পারে।”

“তা হলে পুরস্কারটা কিন্তু আমারই পাওনা। আপনি আমার কথা কি উপর মহলে জানিয়েছেন?”

“আমাদের এফ আই আর-এ স্পষ্ট করেই সব লেখা আছে অবনীবাবু। মিস্টার অবনী ঘোষাল, দি সন-ইন-ল অফ শ্রীনিবাস আচার্য, অ্যাপ্রিহেন্ডেড দি কালপ্রিট পল্টু পাকড়াশি অলমোস্ট সিঙ্গল হ্যান্ডেডলি অ্যান্ড বাই হিজ ওন এফোর্ট। বাট দি আইরেট অ্যান্ড

আনরুলি ক্রাউড ম্যালহ্যান্ডলড দি কালপ্রিট ভেরি ব্যাডলি।"

"বাঃ, বেশ লিখেছেন মশাই। কিন্তু পুরস্কারটা ঘোষণা হচ্ছে না কেন বলুন তো! আমি তো ঠিক করে রেখেছি, টাকাটা পেলেই একখানা ভাল দেখে মোটরবাইক কিনে ফেলব।"

"সে আর বেশি কথা কী। তবে কিনা সরকার বাহাদুর পুরস্কার যদি দেয়ও, তা হলে জ্যান্ত পল্টু পাকড়াশির জন্য দেবে। কিন্তু ছোকরার যা অবস্থা, তাতে বাঁচলে হয়।"

"সর্বনাশ! বাঁচবে না মানে? না বাঁচলে ছাড়ব নাকি? আপনি ওর ভাল রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। দরকার হলে আমি চিকিৎসার খরচ দেব। ফল, মাছ, দুধ, ভিটামিন সব দিন। এই হাজারখানেক টাকা রেখে যাচ্ছি। কোনও অযত্ন না হয় দেখবেন।"

"যে আজ্ঞে। আপনার মনটা বড্ড নরম।"



নবীনকে যেদিন জেলখানায় পাঠাল, তার পরদিন সকালেই নগেন পাকড়াশি ভোলারাম আর চণ্ডীচরণকে ডেকে বলল, "এবার টাকাটা যে উদ্ধার করে আনতে হয় বাপু। দেরি করলে বেহাত হয়ে যেতে পারে।"

ভোলারাম বলে, "ও নিয়ে ভাববেন না। আমাদের লোকেরা আগাগোড়া নজর রেখেছে। নবীনের পাতানো এক পিসি আছে, ননীবালা। অনেক বয়স। টাকাটা তার হেফাজতেই আছে।"

নগেন ঠান্ডা গলায় বলল, "আজই উদ্ধার করা চাই।"

নগেনকে সমঝে চলে না, এমন লোক তল্লাটে নেই। ভোলারাম

একবার বিচালিঘাটের এক মহাজনের কাছে নগেন পাকড়াশির দশ লাখ টাকা পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল। এত টাকা হাতে পেয়ে তার একবার মনে হয়েছিল, টাকাটা নিয়ে পালিয়ে যায়। চিরতরে ভিনদেশে পালিয়ে গেলে নগেন তার নাগাল পাবে না।

আর সেদিনই হঠাৎ টাকার বান্ডিলটা তার হাতে দিয়ে নগেন ভারী আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে ভোলা, এই যে তুই মাঝে-মাঝেই এত এত টাকা একে-ওকে পৌঁছে দিয়ে আসিস, তা তোর কখনও লোভ হয় না? ইচ্ছে হয় না, টাকাটা গাপ করে পালিয়ে যেতে?"

ভোলারাম কেঁপে-ঝেঁপে অস্থির। বলল, "আজ্ঞে না।"

"না হলেই ভাল। আজ পর্যন্ত আমার পয়সা কেউ হজম করতে পারেনি কিনা।"

আর ওই যে গুন্ডা চণ্ডী, তার ভয়ে সবাই থরহরি। কিন্তু চণ্ডীও নগেনের চোখে চোখ রেখে কথা কওয়ার সাহস পায় না। নিশিন্দাপুরে নগেনের বাগানবাড়িতে কালোচরণ দাসের মতো সাংঘাতিক হেক্কোরকে বেয়াদবির জন্য ডান হাতের কবজি মুচড়ে ভেঙে দিয়েছিল নগেন। অথচ কালো একজন পালোয়ান লোক। সেই থেকে চণ্ডী কখনও নগেনের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার কথা ভাবেও না।

টাকাটা উদ্ধার করা শক্ত কিছু ছিল না। ভোলারাম আর চণ্ডী এক রাতে গিয়ে বুড়ির উপর চড়াও হল। বেশি কিছু করতেও হয়নি, গলায় একখানা দা চেপে ধরতেই বুড়ি হাউমাউ করে বলে দিল, "উঠোনে পুবধারে কাঁঠাল গাছের তলায় পোঁতা আছে বাবা। প্রাণটা রক্ষে করো, ও তোমরা নিয়ে যাও।"

কাঁঠাল গাছের তলা বেশি খুঁড়তেও হয়নি। হাতখানেক গর্তের নীচেই পিতলের ডাবরখানা ছিল। তাতে পাঁচ লাখ নগদ টাকা।

সুতরাং সব দিক দিয়েই সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গিয়েছিল। পল্টুকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে নামধাম পালটে অনেক দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে ফাঁসি যাওয়া একরকম ঠিকই হয়ে ছিল নবীন দাসের। পাঁচ লাখ টাকাও উদ্ধার হয়ে গিয়েছে। সুতরাং নগেন নিশ্চিন্ত ছিল। ফাঁসিটা মানে-মানে হয়ে গেলেই হল।

ঠিক এই সময়ে খবর এল যে, নবীন পালিয়েছে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! নবীন পালিয়েছে মানে বিপদ। যদি ধরা পড়ে, তা হলে সব ষড়যন্ত্রটাই ফাঁস হয়ে যাওয়ার কথা। পুলিশ এসে নগেনের বাড়ি রোজ তছনছ করতে লাগল পল্টু পাকড়াশির খোঁজে।

নগেন ঠান্ডা মাথার লোক। মোটেই উত্তেজিত হল না। চণ্ডীকে ডেকে বলল, "নবীন পালিয়েছে বটে, কিন্তু ওর লোকবল বা অর্থবল নেই। বড় জোর ছুটে আর হেঁটে কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। বেঁচে থাকলে আমাদের বিপদ। কারণ, ধরা পড়ে অনেক কথা কইবে। সুতরাং পুলিশ ওকে জেরা শুরু করার আগেই নিকেশ করা চাই। এমন ব্যবস্থা করে আসবি, যাতে লাশ শনাক্ত করা না যায়।"

দু'জন সঙ্গী নিয়ে চণ্ডী বেরিয়ে পড়ল।

পল্টুর পালানোর খবর পেয়েছিল শিবতলার ভুবন মণ্ডলও। ভুবন মণ্ডলকে দৈত্য বললেও বলা যায়। যেমন তাল গাছের মতো ঢ্যাঙা, তেমনই পালোয়ানি চেহারা। ভয় বস্তুটি কী, তা তার জানা নেই। সে যদি ষণ্ডামি-গুন্ডামির পন্থা নিত, তা হলে গোটা পরগনায় তার জুড়ি কেউ থাকত না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ভুবন মণ্ডল ধর্মভীরু মানুষ। মেজাজও ঠান্ডা। কিন্তু একটা মুশকিল হল, যদি কোনও কারণে সে হঠাৎ রেগে যায়, তা হলে চারপাশে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ছাড়ে। তখন আর তার কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু থাকে না। বছর দুই

আগে তার সহোদর ভাই গগন মণ্ডল যখন বাজিতপুরে খুন হয়, তখনও একবার মাথায় খুন চেপেছিল তার। কিন্তু খুনিটা কে, তা জানা ছিল না বলে সে কয়েকটা মোটাসোটা গাছ দু' হাতে উপড়ে আর কয়েকটা পাথর কিলিয়ে ভেঙে রাগটা প্রশমিত করে। তারপর যখন খুনি পল্টু পাকড়াশি ধরা পড়ে, তখন সে পল্টুকে গলা টিপে মারবে বলে প্রথমে আদালতে, পরে লকআপেও হানা দেয়। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। তবে শেষ পর্যন্ত পল্টুর ফাঁসির হুকুম হওয়ায় সে খানিকটা ঠান্ডা হতে পেরেছিল।

পল্টু পালিয়েছে শুনে ভুবন মণ্ডলের শান্ত মাথাটায় আবার দপ করে আগুন জ্বলে উঠল।

তবে সে তাড়াহুড়ো করল না। এটা সে জানে যে, কলেবরটা বিরাট হলেও এবং গায়ে অসুরের জোর থাকলেও তার বুদ্ধি খুব একটা বেশি নয়। এর আগে গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে সে বিস্তর ঝামেলায় পড়েছে। তাই মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য বড় একখানা বগিথালায় একথালা পান্তাভাত, একছড়া তেঁতুল আর আখের গুড় দিয়ে সাপটে মেরে দিল সে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তার প্রিয় কুড়ুলখানা পাথর আর শিরীষ কাগজে ঘষে ভাল করে ধার তুলল। খাটো ধুতিখানা আঁট করে মালকোচা মেরে পরে ফেলল। গায়ে খাটো পিরানখানা চাপিয়ে মা কালীকে পেন্নাম ঠুকে বেরিয়ে পড়ল।

বিশু গায়েনের সঙ্গে যে গোখরো সাপের খুব মিল আছে, এটা অনেকেই মানে। হিলহিলে পাকানো চেহারা, চোখে হিমশীতল চাউনি আর প্রখর বুদ্ধি।

কালীপদ নস্কর ছিল বিশুর জামাই। কালীপদ পল্টুরই বয়সি, ইয়ারবন্ধুও বটে। ব্যাবসাও করত একসঙ্গে। সেই ব্যাবসা নিয়েই একদিন বচসা হল, ঝগড়াঝাঁটি হল। মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর কী হল কে জানে, একদিন ভোরবেলা এসে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে তুলে কালীপদকে উঠোনে টেনে নিয়ে গিয়ে তার বউয়ের সামনেই খুন করে রেখে গেল পল্টু। বিশুর ওই একটাই সন্তান, মেয়ে মানময়ী। মাত্র আঠেরো বছর বয়সেই বিধবা মানময়ী এখনও হাহাকার করে রোজ কাঁদে। বিশুর সহ্য হয় না। পল্টুর ফাঁসির খবরে মেয়েটা একটু দম ধরেছিল।

বিশু অবশ্য কখনওই ভোলেনি। এখন পল্টুর জেল থেকে পালানোর খবর পেয়ে সে সকালবেলাতেই বেরিয়ে পড়ল। আশপাশের সব গাঁয়েই তার চেনা লোক আছে। তার ধান আর শস্যবীজের গাহেক সর্বত্র। লোকে তাকে ভয় পায়, খাতিরও করে।

লাটপুরের গন্ধর্ব সেনাপতি বলল, "পাকা খবর জানি না, তবে অষ্টপুর থানায় একজন ফেরারি আসামি ধরা পড়েছে বলে কানাঘুষো শুনেছি। দেখোগে যাও।"

গোখরো সাপের সঙ্গে বিশু গায়েনের একটু তফাতও আছে। সাপ জাতটার বুদ্ধি নেই। তাই কখনও পোষ মানে না, স্মৃতি বলে কিছু কাজও করে না। কিন্তু বিশু বুদ্ধিমান। সে যা করবে, তাতে নাটুকেপনা থাকবে না। হাল্লাচিল্লা বা হাঙ্গামা থাকবে না, নিঃশব্দে কাজ হয়ে যাবে।

মোটরবাইকের মুখ ঘুরিয়ে বিশু অষ্টপুর রওনা হয়ে পড়ল।

অষ্টপুরের হরেন চাটুজ্যের মা মৃদুভাষিণী দেবী ভোররাতে স্বপ্ন দেখলেন, যিশুবাবার হাত আর পায়ের ক্ষতস্থান থেকে নতুন করে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। প্রণাম করে উঠেই এই দৃশ্য দেখে তিনি "ও মাগো," বলে আর্তনাদ করে তাড়াতাড়ি বেদিতে উঠে আঁচল দিয়ে ক্ষতস্থান মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, "পেরেকগুলো এবার খুলে নিলেই তো হয় বাবা! এতদিন হয়ে গিয়েছে, এখনও পেরেকগুলো আছে কেন বলো তো!"

যিশুবাবা ভারী সুন্দর করে হেসে বললেন, "ও কি আজকের পেরেক রে! যতবার খুলবি, ততবারই মানুষ ফের পেরেকে গেঁথে দেবে আমায়। আমার ক্ষত তো সারবার নয়।"

"কেন বাবা, কেন এত কষ্ট তোমার?"

"আমার কোনও কষ্ট নেই। মানুষের কষ্টই পেরেক হয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। ওই যে ছেলেটাকে ওরা কত মারল, সব মার এসে লাগল আমার গায়ে। জুড়োই কী করে বল তো?"

"তাই তো বাবা! মানুষের কষ্টই তো তোমার কষ্ট। ছেলেটাকে বড্ড মেরেছিল ওরা। মানুষের কি আর মায়াদয়া আছে!"

গির্জার পাঁচধাপ সিঁড়ি, তারপর একটু বাঁধানো জায়গা, সেটা পেরিয়ে দরজা। ওই দরজার বাইরেই শুয়ে ছিল উদ্ধব খটিক। শোওয়ার পক্ষে দিব্যি জায়গা। উপরে ছাউনি আছে, বৃষ্টি-বাদলায় কষ্ট নেই।

ভোরবেলা একজন উটকো লোককে দরজা আটকে শুয়ে থাকতে দেখে মৃদুভাষিণী অবাক আর বিরক্ত হয়ে বললেন, "কে রে অলপ্পেয়ে লক্ষ্মীছাড়া! দরজা আটকে শুয়ে আছিস? এটা কি জমিদারি পেয়েছিস হতভাগা? মুলুকে আর কোথাও শোওয়ার জায়গা জুটল না তোর?"

উদ্ধব আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে বলল, "আমার জন্য কে আর বিছানা পেতে রেখেছে বলুন! হ্যাঁ গো ঠাকুমা, লোকে যে বলে আপনি যিশু ভজনা করে খিরিস্তান হয়েছেন, সে কি সত্যি?"

"হলে হয়েছি, তাতে তোদের কী রে মুখপোড়া? বেশ করব খিরিস্তান হব, জুতোমোজা পরব, পাউরুটি খাব। তাতে তোর গায়ে ফোসকা পড়ে কেন? এখন পথ ছাড় তো বাপু, ভিতরে আমার কাজ আছে।"

"হুটপাট করা কি ঠিক হচ্ছে ঠাকুমা, ভিতরে ঝাঁটপাট হচ্ছে যে!"

মৃদুভাষিণীর একগাল মাছি! বলে কী রে ছোঁড়া!

"গির্জায় আবার ঝাঁটপাট দেবে কে? কার গরজ? কার মাথাব্যথা?"

উদ্ধব মাথা নেড়ে বলে, "তা জানি না, তবে রোজ সকালে গির্জার ভিতরে ঝাঁটপাটের আওয়াজ শুনতে পাই।"

মৃদুভাষিণী থমকালেন, তাই তো! গির্জাটা সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কী করে থাকে, তা তো তিনি কখনও ভেবে দেখেননি। তিনি বললেন, "তা হ্যাঁ রে উদ্ধব, ঝাঁটপাট কে দেয়, তা উঁকি মেরে দেখিসনি?"

উদ্ধব ফের মাথা নেড়ে বলে, "না ঠাকুমা, ওসব অশৈলী কাণ্ড। কাজ কী ওদের ঘাঁটিয়ে? মাঠে-ঘাটে, আনাচেকানাচে পড়ে থাকতে হয় আমাদের, কত অশৈলী কাণ্ডই চোখে পড়ে। কিন্তু ঘাঁটাতে যাই না। যা হচ্ছে হোক, কাজ কী আমার খতেন নেওয়ার, না কী বলুন!"

মৃদুভাষিণী চিন্তিত মুখে বলেন, "তা তো বুঝলুম বাছা, কিন্তু আমার যে একটু কাজ ছিল।"

"এত ভোরে কী কাজ গো ঠাকুমা, আপনি তো মোমবাতি জ্বালাতে সেই সন্ধেবেলাটিতে আসেন!"

"ভোররাতে একটা খারাপ স্বপন দেখেছি রে বাপু, যিশুবাবার হাত-পায়ের ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। তাই বড় দুশ্চিন্তা হল, ভাবলুম সত্যি কিনা গিয়ে দেখে আসি।"

উদ্ধব কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বলল, "তাই আপনার হাতে ডেটলের শিশি, তুলো আর গজ দেখছি বটে! এঃ হেঃ, লোকে যে হাসবে ঠাকুমা! পাথরের যিশুর গা থেকে রক্ত বেরোবে কী

গো! তবে আপনার ভক্তি আছে বটে। যিশুবাবাকে আপনি বড্ড ভালবাসেন দেখছি।"

"তা সত্যি। যিশুবাবাকে কেমন গোপালঠাকুরের মতো লাগে রে।"

"ও যিশুই বলুন আর গোপালঠাকুরই বলুন, মা কালীর কাছে কেউ লাগে না। যিশুবাবার ধরনধারণ তো মোটেই পছন্দ হয় না আমার, মেনিমুখো মিনমিনে পুরুষ, ধরেবেঁধে নিয়ে পেরেকে গেঁথে দিল আর উনিও অমনি গা এলিয়ে ঝুলে রইলেন! আর শিষ্যগুলোই বা কেমন ধারা, বাবা বারণ করল বলেই বাবাকে রক্ষে করতে কেউ এগোলি না! গোপালঠাকুরের কথাও আর কবেন না, সারাটা জীবন তো বাঁশি বাজিয়ে আর ফস্টিনস্টি করেই কাটিয়ে দিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে একটা তিরও ছোড়েননি। আর মা কালীকে দেখুন, কচাকচ মুন্ডু কেটে অসুরব্যাটাদের কেমন সবক শেখাচ্ছেন! দেখলে ভয়ও হয়, ভক্তিও হয়।"

"দূর পোড়ারমুখো, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে কি ওসব বলতে আছে! আমাদের কালী ভাল, গোপালও ভাল, যিশুও ভাল। হ্যাঁ রে, দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো চাবিটা দিয়ে দরজার তালাটা খুলবি তো! বসে আছিস কেন হাঁ করে? সৃষ্টির কাজ ফেলে এসেছি যে!"

শশব্যস্তে উঠে দরজায় কান পেতে উদ্ধব খানিকক্ষণ শুনে নিয়ে বলল, "ঝাড়পোঁছের শব্দ বন্ধ হয়েছে।"

তালাটা খুলে দরজা হাট করে দিয়ে বলল, "এবার যান ঠাকুমা।"

ভিতরে ঢুকে দেখা গেল যিশুবাবার মূর্তি যেমন কে তেমনই আছে। তবু মৃদুভাষিণী ভারী মায়াভরে পা আর হাতের ক্ষতস্থানগুলো তুলো দিয়ে পুঁছে দিলেন। চোখে জল আসছিল, মৃদু স্বরে বললেন,

“তোমার বড় কষ্ট বাবা। ইচ্ছে হয় পেরেকগুলো উপড়ে ফেলে দিই।”

“কী যে বলেন ঠাকুমা, পেরেক ওপড়ালে আর যিশুবাবার থাকে কী? পেরেক না হলে কি যিশুঠাকুরকে চেনা যায়?”

মৃদুভাষিণী ফঁৎ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, “হ্যাঁ রে উদ্ধব, লোকে বলে তুই নাকি চোর?”

উদ্ধব মাথা চুলকোতে চুলকোতে দেঁতো হাসি হেসে বলে, “এই প্রাতঃকালটায় দিব্যি তো ঠাকুর-দেবতার কথা হচ্ছিল ঠাকুমা, হঠাৎ আবার ওসব কথা কেন?”

“লোকের কাছে শুনি তোকে নাকি হাতকড়া পরালে চোখের পলকে খুলে ফেলিস, গারদে পুরলে এক লহমায় তালা খুলে পালিয়ে যাস। হয়রান হয়ে হয়ে নাকি শেষ পর্যন্ত প্রাণপতি দারোগা হাল ছেড়ে দিয়েছে!”

“লোকের কথা ধরবেন না ঠাকুমা। তারা সব বাড়িয়ে বলে।”

“স্বপনে কী দেখলুম জানিস বাবা! ওই যে ছোঁড়াটাকে হাটুরে মার দিয়ে সবাই আধমরা করে তারপর ফাটকে পুরে রেখেছে, ওর জন্য যিশুবাবার বড় কষ্ট। তা বাপু, তোর যদি এতই হাতযশ, তা হলে ছোঁড়াটাকে চুপিচুপি বের করে দে না বাবা। পালিয়ে বাঁচুক।”

উদ্ধব মাথা নেড়ে বলে, “লাভ নেই গো ঠাকুমা, ছোঁড়া ফাঁসির আসামি। সদর থেকে পুলিশের দল আসছে নিয়ে যেতে। ফাঁসিতে ঝোলাবে। ছেড়ে দিলেও পালাতে পারবে না। ছোঁড়া তেমন পাকাপোক্ত মানুষ নয় কিনা।”

“আহা, ছোঁড়ার মা না জানি কত কান্নাকাটি করছে! দেখ না বাবা কিছু করতে পারিস কি না।”



নাকের ইংরেজি যে নোজ এটা ঘণ্টাপাগলা জানে। সে মাথা, কান, চোখ, হাত, পা, এমনকী পেটের ইংরেজিও জানে। বয়, গার্ল, গুড মর্নিং, গুড নাইট, থ্যাঙ্ক ইউ এসব ধরলে জানে সে মেলাই। আর কয়েকটা শিখতে পারলেই ইংরেজিটা সড়গড় হয়ে যায়। কিন্তু মুশকিল হল, শেখায় কে? বলাইমাস্টারকে ধরেছিল ঘণ্টা, কিন্তু বলাইমাস্টার আঁতকে উঠে বলল, "তোকে ইংরেজি শেখাব, অত বিদ্যে আমার পেটে নেই।"

কিন্তু ইংরেজিটা জানলে ভারী সুবিধেই হয় ঘণ্টার। এই তো সেদিন বিজুবউদিকে গিয়ে ফটাফট ইংরেজি শুনিয়ে দিয়েছিল ঘণ্টা। তাতে বউদি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খুব হেসেছিল বটে, কিন্তু একখানার বদলে সেদিন দু'-দু'খানা গরম আটার রুটি আর এক খাবলা আলুচচ্চড়ি দিয়েছিল। ইংরেজির খাতিরই আলাদা।

ইংরেজি অক্ষরের ছিরিছাঁদও ভারী পছন্দ ঘণ্টার। যেন সারি-সারি টেবিল, চেয়ার, পিরিচ, চামচ, কাঁটাচামচ, টুপি, পাতলুন সব সাজানো। আজ সকালে বনমালী পোদ্দার তাকে একটা ইংরেজি কাগজের ঠোঙায় একঠোঙা মুড়ি আর বাতাসা দিয়েছিল। চৌপথীর ধারে কাঁঠালগাছের তলায় বসে মুড়িটা খেয়ে ঠোঙাটা নিয়ে পড়েছিল ঘণ্টা। অক্ষরগুলো মুগ্ধ হয়ে দেখছিল সে। বাহ্যজ্ঞান নেই।

ঠিক এই সময়ে ভজন ভশ্চায এসে ধরে পড়ল, "ও বাবা ঘণ্টা, দুটো টাকা দেব'খন, আমার গোরুটা খুঁজে এনে দে। হাটখোলার মাঠে বাঁধা ছিল, খোঁটা উপড়ে পালিয়েছে।"

ঘণ্টা গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার সময় নেই পণ্ডিতমশাই, আমি এখন লেখাপড়া করছি।"

"ওরে সে হবে'খন। তোর লেখাপড়া আটকায় কে? দুইয়ের জায়গায় না হয় তিনটে টাকাই পাবি বাবা। খুঁজে আন, নইলে কে কোথায় ধরে নিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়ে দেবে! আমার মাজায় যে বড্ড ব্যথা রে বাবা!"

ভারী বিরক্ত হয়ে ঘণ্টা বলে, "এরকম করলে তো চলে না মশাই, আমার লেখাপড়ায় যে বড্ড ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে!"

"ইংরেজির কথা কইছিস তো। ওরে, সে তো কবেই তোর ট্যাঁকে গোঁজা হয়ে গিয়েছে। এই তো সেদিন বিজুবউমা বলছিল, তুই এমন ইংরেজি বলেছিলি যে, কোলের খোকাটা পর্যন্ত ভয়ে কেঁদে উঠেছিল। ইংরেজিতে তোকে আটকায় কে?"

দিনকাল ভাল নয়। বাজারটাও খারাপ পড়েছে। এ বাজারে তিনটে টাকাও তো কম কথা নয়! তাই ঠোঙাটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে উঠে পড়ল ঘণ্টা। ভশ্চাযমশাইয়ের গোরুটা তার পক্ষে বড্ডই পয়া। মাঝে-মাঝেই খোঁটা উপড়ে পালায়। ভশ্চাযমশাইয়ের মাজার ব্যথার দরুন গোরু বাবদ ঘণ্টার একটু আয়পয় হয়। গোরু খুঁজতে তার কিছু খারাপ লাগে না। পাঁচজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তা হয়, গাঁ-টাও একটু চক্কর মেরে আসা হয়।

হরিশরণ চৌবের আখড়ার ধারে একটু দাঁড়িয়ে গেল ঘণ্টা।

"গুড মর্নিং চৌবেজি!"

হরিশরণ উঠোনে খাটিয়ায় বসে ঘোলের শরবত খাচ্ছিল। নিমীলিত চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, "অংরেজি বলবি তো খোপড়ি খুলে লিব।"

একগাল হেসে ঘণ্টা বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।"

হরেন চাটুজ্যে বাজার নিয়ে ফিরছিলেন, দেখা হতেই ঘণ্টা খুব

বিনয়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করল, "হাউ ডু? হাউ ডু?"

হরেন চাটুজ্যে ম্লান মুখে মাথা নেড়ে বললেন, "না রে, হাডুডু সেই বয়সকালে খেলতুম বটে, এখন হাঁটুর ব্যথায় যে বড্ড কাবু হয়ে পড়েছি বাপ।"

"থ্যাঙ্ক ইউ!" বলে ঘণ্টা গটগট করে এগিয়ে যায়।

স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই জ্ঞানবাবু হন্তদন্ত হয়ে টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরছিলেন, ঘণ্টা তাঁর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "কাম ইন! কাম ইন!"

জ্ঞানবাবু বিরক্ত হয়ে রোষকষায়িত লোচনে তার দিকে চেয়ে বললেন, "হাতে বেতটা থাকলে এখন ঘা কতক দিতুম, বুঝলি! এটা কি তোর বৈঠকখানা যে, বড় অ্যাপ্যায়ন করছিস?"

"গুড বাই!" বলে ঘণ্টা এগোতে থাকে।

গোরু খোঁজার মজাটাই এইখানে। কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। তবে ইংরেজিটা যে সবাই বোঝে তা নয়। গাঁয়ের লোক তো, বুঝবে কী করে। এই তো সেদিন মৃদুভাষিণী দিদিমাকে গিয়ে ঘণ্টা বলেছিল, "একটু লেগডাস্ট দিন।" তা দিদিমা কী বুঝতে কী বুঝে 'ওম্মা গো, হতচ্ছাড়াটা বলে কী!' বলে এমন চেঁচালেন যে ঘণ্টাকে পালিয়ে আসতে হয়।

তবে ঘণ্টার নামডাকও আছে। এই তো সেদিন দুপুরবেলা থানার বড়বাবু প্রাণপতি খাসনবিশ তাঁর অফিসে বসে আছেন। এমন সময় এক ভদ্রমহিলা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতেই প্রাণপতি সচকিত হয়ে উঠলেন। ভদ্রমহিলাকে তাঁর খুবই চেনা-চেনা লাগছিল। খাতির করে বললেন, "বসুন বউদি, বসুন।"

তখন কনস্টেবল ফটিক তাঁর কানে-কানে বলল, "বড়বাবু, ইনি আমাদের বউদি বটে, কিন্তু আপনার বউদি নন।"

প্রাণপতি অবাক হয়ে বললেন, "কেন? কেন?"

তখন ফটিক বলল, "আপনার বউদি হওয়ায় এঁর কিছু অসুবিধে আছে। কারণ, ইনি আপনার বউ।"

তখন প্রাণপতি ভারী লজ্জিত হয়ে বললেন, "ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই যেন চেনা-চেনা ঠেকছিল বটে।"

বিজুবউদি তখনই খুব রাগ করে বলেছিলেন, "তোমার চাইতে ঘণ্টাপাগলাও ভাল।"

কথাটা কানে আসায় ঘণ্টার ভারী দেমাক হয়েছিল। স্বয়ং দারোগাবাবুর সঙ্গে তার তুলনা হচ্ছে! ব্যাপারটা তো ফ্যালনা নয়!

দিঘি ছাড়িয়ে বাঁয়ে ফস্টারসাহেবের ভুতুড়ে বাড়ির দিকটার নীলকুঠির জঙ্গলে ঢুকে গোরুটাকে গোরুখোঁজা করতে-করতে হঠাৎ দানোটার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল ঘণ্টা। প্রথমে গাছতলায় মুখোমুখি লোকটাকে দেখে ঘণ্টা ইংরেজিতে "কে তুমি?" বলতে গিয়ে বলে ফেলেছিল "হোয়াই ইউ?" লোকটা অবশ্য জবাব দিল না। তখন ঘণ্টা দেখল, লোকটার চোখ বোজা। তারপর যা দেখল, তাতে তার হাতে-পায়ে খিল ধরার উপক্রম। লোকটা দাঁড়িয়ে নয়, ঠ্যাং ছড়িয়ে ঘাসমাটির উপর বসে গাছে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বসা অবস্থাতেই তার মাথাটা ঘণ্টার মাথার সমান-সমান। শুধু তাই নয়, তার পাশে একখানা রক্তমাখা কুড়ুল।



"জামাইবাবু যে! নমস্কার, নমস্কার! কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য!"

পল্টু পাকড়াশিকে পাকড়াও করার জন্য সরকার বাহাদুর কোনও পুরস্কার ঘোষণা করেছে কি না সেটা জানতে থানায় এসেছিল অবনী ঘোষাল। করেনি শুনে ভারী হতাশ হয়ে থানা থেকে বেরোবার মুখেই অবনী ঘোষালের পথ আটকাল একটা বেশ হাসিখুশি আহ্লাদি চেহারার উটকো লোক। অবনীর মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। এই নিয়ে চার-চারটে দিন কেটে গেল, সরকারের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দই নেই! এরকম চললে মোটরবাইকটা কেনার কী হবে তা ভেবে পাচ্ছিল না অবনী। এই পোড়া দেশে ভাল কাজের কি কোনও দামই নেই?

ঠিক এই সময় লোকটা গ্যালগ্যালে মুখে তার পথ আটকে দাঁড়াতেই অবনী বিরক্ত হয়ে বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার। আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি মশাই!"

"তা তো ব্যস্ত থাকারই কথা! চারদিকে যে আপনাকে নিয়ে ধন্যি-ধন্যি হচ্ছে জামাইবাবু! লোকে তো শতমুখে আপনার সুখ্যাতি করে বেড়াচ্ছে! সেদিন তো গাবতলির হাটে শুনলুম, এক কবিয়াল গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে আপনাকে নিয়ে গান বেঁধে গাইছে, আর লোকে শুনছেও ভিড় করে। অষ্টপুরে অবতীর্ণ মোদের জামাই, সবারে ভরসা দিল আর ভয় নাই..."

অবনী পুলকিত হয়ে বলে, "তাই নাকি?"

"তবে? আমি তো আপনার দর্শন পাব বলে সেই দোগাছি থেকে আসছি।"



"বটে!"

"তা জামাইবাবু, অষ্টপুরের লোকেরা আপনাকে সংবর্ধনা-টংবর্ধনা দিচ্ছে না?"

"না হে বাপু, সেসব লক্ষণ তো কিছু দেখছি না!"

"এঃ, এটা তো ভারী অন্যায় কথা! প্রাণ হাতে করে আপনি যে অষ্টপুরের অত বড় একটা খুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করলেন, তার কি একটা দাম নেই? কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা কথা আছে, নাকি?"

"সে তো বটেই।"

লোকটা গলা আরও দু' পরদা নামিয়ে বলল, "তবে কি জানেন জামাইবাবু, অষ্টপুরে গিজগিজ করছে খারাপ লোক। খুনে, গুন্ডা, পকেটমার, চোর, ডাকাত, কেপমার একেবারে ছয়লাপ। এ তো সবে শুরু।"

অবনী একটু থতমত খেয়ে বলে, "না-না, আমি আর অষ্টপুরের উপকার করতে পারব না মশাই, আমার কাজকর্ম পড়ে আছে।"

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলে, "আপনি না চাইলেই তো হবে না জামাইবাবু, চোর-গুন্ডা-বদমাশরা সেকথা শুনবে কেন? তাদেরও তো একটা প্রেস্টিজ আছে!"

"তার মানে?"

লোকটা গলা আরও এক পরদা নামিয়ে বলে, "আজ্ঞে, সেই খবর পেয়েই তো আসা।"

"খবর! কীসের খবর মশাই?"

"পরশু রাত্তিরে যে শ্মশানের পাশের আমবাগানে বিরাট মিটিং হয়ে গেল! জোর বক্তৃতা হল মশাই, শুনলে গা গরম হয়ে যায়।"

অবনী ঘোষাল একটু ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বলল, "তা তারা কী নিয়ে বক্তৃতা করছিল?"

"আজ্ঞে, আপনাকে নিয়েই। তাদের আঁতে বড্ড লেগেছে কিনা। একজন নিরীহ চোরকে ওরকম ভাবে পেটানোয় তারা বেজায় চটে গিয়েছে। নাটা শিট তো বেশ জবরদস্ত বাগ্মী। বলছিল, 'একজন নবীন প্রতিভা, একজন উদীয়মান শিল্পীর উত্থানকে এভাবে থামিয়ে দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, মহাপাপ। কত বড় একটা সম্ভাবনার অকালমৃত্যু ঘটতে যাচ্ছিল, তা ভেবে আমাদের আশঙ্কা হয়। এই ঘটনার পিছনে নাটের গুরু হল শ্রীনিবাস আচার্যির ছোট জামাই মহাপাষণ্ড, কুলাঙ্গার, কাপুরুষ এবং অহংকারী অবনী ঘোষাল। ভাইসব, এই অবনী ঘোষাল দেশ ও দশের শত্রু, নরঘাতক, রক্তলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক এবং মহাপাপী। পল্টু পাকড়াশির গণধোলাইয়ের পিছনে শুধু এর নোংরা হাতই ছিল না, এই অবনী ঘোষাল আবার এই অপকর্মের জন্য সরকার বাহাদুরের পুরস্কার পাওয়ার জন্যও ঘোরাঘুরি করছে। আপনাদের কাছে আজ আমার বিনীত আবেদন, অবনী ঘোষালকে এই অষ্টপুরের মাটিতেই কবর দিন। সে যেন আর অষ্টপুরের সীমানা ডিঙোতে না পারে।' ওঃ, এসব শুনে যা হাততালি পড়ল না জামাইবাবু যে, অত রাতেও কাকগুলো কা কা করে ভয়ে বাসা ছেড়ে উড়ে পড়েছিল।"

অবনী ঘোষাল শুকনো মুখে একটা ঢোক গিলে বলল, "কিন্তু পল্টু পাকড়াশি তো অষ্টপুরের ছেলে নয়! তা হলে অষ্টপুরের লোক রেগে যাচ্ছে কেন?"

"আজ্ঞে, সে কথাও উঠেছিল জামাইবাবু। দামোদর হাতি কথাটা তুলে বলেছিল, 'পল্টু পাকড়াশি বহিরাগত, ফরেনার। সে ভূমিপুত্তুর নয়। তার জন্য অষ্টপুরের জামাইকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা উচিত হবে কি না।' তাতে গদাই মল্লিক জলদগম্ভীর গলায় খুব ভাবাবেগ দিয়ে বলতে লাগল, 'ভাইসব, অপরাধ জগতে বহিরাগত বলে কিছু নেই। গুন্ডা ভারতবাসী, চোর ভারতবাসী, ডাকাত ভারতবাসী, খুনি

ভারতবাসী আমার ভাই, আমার আত্মার আত্মীয়। তাদের অপমানে আমাদেরও অপমান। তাদের ব্যথা, তাদের বেদনা আমাদেরই ব্যথা ও বেদনা...' ওঃ জামাইবাবু, কী বলব আপনাকে, গদাইয়ের বক্তৃতা শুনে অনেকে চোখের জল চাপতে পারেনি। শেষে সভায় ঐকমত্য হল যে, অবনী ঘোষালকে প্রথমে হাটুরে প্রহার, তারপর জীয়ন্ত কবর দেওয়া হবে, যাতে এরকম অসামাজিক এবং অমানবিক কাজে নামবার আগে জনসাধারণ সতর্ক হয়।"

অবনী ঘোষাল কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "কিন্তু পল্টু পাকড়াশিকে মেরেছে তো পাবলিক, আমার কী করার ছিল বলুন!"

"আহা, সেসব আলোচনাও কি হয়নি জামাইবাবু! পশুপতি গুছাইত তো পষ্ট করেই বলল, 'অবনী ঘোষাল যদি জনতাকে খেপিয়ে না তুলত, তাদের উত্তেজিত করার জন্য ইন্ধন না ছড়াত, তা হলে এরকম নারকীয় ঘটনা ঘটতে পারত না। আপনারা জানেন অষ্টপুর একটি শান্তিপ্রিয় জায়গা, এখানে দারোগা পুলিশ পর্যন্ত আলস্যে সময় কাটায়। ওই যমতুল্য জামাইটি এসেই আজ অষ্টপুরের চরিত্র নষ্ট করেছে। ভাইসব, ওই অবনী ঘোষালের রক্তে হাত না রাঙালে আমাদের শান্তি নেই।' ওঃ, তাই শুনে কী উল্লাস চারদিকে!"

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে অবনী বলে, "আচ্ছা, আমার যে ভারী জলতেষ্টা পেয়েছে!"

"তার আর ভাবনা কী! এই যে আমার জলের বোতলটা নিয়ে ঢকঢক করে মেরে দিন।"

জল খেয়ে বোতলটা ফিরিয়ে দিয়ে অবনী বলে, "আচ্ছা, এখান থেকে হরিপুর যাওয়ার পরের বাসটা কখন ছাড়বে যেন!"

"বেলা তিনটের আগে নয়। কিন্তু জামাইবাবু, অষ্টপুরকে এইসব গুন্ডা-বদমাশদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনি কোথায় যাবেন? আর

অষ্টপুরের জনগণই কি আপনাকে ছাড়বে ভেবেছেন? তারা যে আপনার মুখাপেক্ষী হয়েই আছে।"

অবনী সখেদে বলল, "অষ্টপুরে বিয়ে করাটাই আমার মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে দেখছি। এর চেয়ে বিষ্টুপুরে বিয়ে করলে অনেক ভাল ছিল।"

"আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা অষ্টপুরে আপনার যা নাম হল, এমন ক'জনের ভাগ্যে হয় বলুন! এই তো পুলক মিত্তির বারোখানা যাত্রাপালা লিখেও তেমন নাম করতে পারল না, মদন মালো এত বড় পালোয়ান হয়ে তেমন সুখ্যাতি পেল না, প্রহ্লাদ প্রামাণিক আড়াইশো রসগোল্লা খেয়ে বিশ্বরেকর্ড করা সত্ত্বেও ক'জন তার নাম জানে বলুন। আর আপনার নাম এখন দশটা গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে ফিরছে। বাঘা যতীন, ক্ষুদিরামের পরেই এখন আপনার সুখ্যাতি। তার উপর ধরুন, অষ্টপুরের গুন্ডা-বদমাশরাও তো ছেড়ে কথা কওয়ার লোক নয়। তারা সব রাস্তাঘাট, অলিগলিতে নজর রেখেছে। এই যে একটু আগে মাথায় গামছা জড়ানো একটা লোক উত্তর দিকে হেঁটে গেল, আর তারপরেই যে বেঁটেমতো একজন ঝাঁকা মাথায় দক্ষিণ দিকে দুলকি চালে যাচ্ছিল, তাদের দেখে কিছু বুঝলেন?"

"আজ্ঞে না।"

"ওরা হল গে অষ্টপুরের নষ্ট লোকদের আড়কাঠি। আপনার উপর আড়ায়-আড়ায় নজর রাখছে। পালানোর উপক্রম হলেই..."

"ওরে বাবা! কিন্তু আমার মায়ের যে বড় অসুখ! আমার আজই রওনা হওয়া দরকার।"

"সে তো ঠিকই। বড়ই দুঃখের কথা। মায়ের অসুখ হলে তো রওনা হয়ে পড়াই দরকার। কিন্তু জামাইবাবু, আমি যেন কানাঘুষো শুনেছিলুম যে, গত বছরই আপনার মায়ের গুরুতর অসুখ হয়ে

তিনি গঙ্গাযাত্রা করেছিলেন। কালাশৌচ পড়ে যাওয়ায় আপনার বিয়ে ছয়মাস পিছিয়ে এই গত আষাঢ়ে হয়েছে! কথাটা কি তা হলে গুজব?”

“অসুখটা ঠিক মায়ের নয় বটে, আমার এক মাসির। আমি তার ছেলের মতোই।”

“তা তো বটেই। মায়ের বদলে মাসির অসুখ হওয়াও খুব খারাপ। তা দেখুন, তিনটে দশের বাসটা যদি ধরতে পারেন।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। বরং পুলিশ পাহারা নিয়ে এই বাসটাই ধরে ফেলি। কী বলেন?”

“আজ্ঞে, পুলিশ পাহারাও নিতে পারেন। তবে কিনা অষ্টপুর থানার সেপাইদের তেমন বীরত্বের খ্যাতি নেই। বছর দশেক আগে রামভজন সিংহ নামে এক সেপাই ছিল। শোনা যায়, কালুডাকাত যখন নবকান্তবাবুর বাড়িতে ডাকাতি করতে এসেছিল, তখন ডাকাতি সেরে পালানোর সময় একজন ডাকাত একটু পিছিয়ে পড়ায় ওই রামভজন তাকে জাপটে ধরে। অষ্টপুর থানার শেষ বীর বলতে ওই রামভজন, তা সেও তো কবেই রিটায়ার করে দেশে চলে গিয়েছে।”

“ডাকাতটাকে ধরে কী করা হল?”

“ধরে রাখা যায়নি যে। সে রামভজনকে কাতুকুতু দিয়ে পালিয়ে যায়। প্রাণপতিবাবু তো গত পরশুদিনই তাঁর নিজের বউকে ভুল করে ‘বউদি’ বলে ডেকে ফেলেছিলেন। শুধু কি তাই? স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় একটা ফুটফুটে মেয়েকে দেখে থুতনি নেড়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘বাঃ খুকি, ভারী মিষ্টি দেখতে তো! নাম কী তোমার?’ বললে পেত্যয় যাবেন না, ওই খুকিটি প্রাণপতিবাবুর নিজেরই মেয়ে।”

“বলেন কী মশাই!”

"আরও শুনবেন? হেড কনস্টেবল ফটিক তবলা বাজিয়ে বেড়ায়, বক্রেশ্বরের হাতযশ হোমিয়োপ্যাথিতে, ছোট কনস্টেবল তন্ময় পাল কবিতা লেখে, নন্দগোপাল হালুই ঘুড়ি ওড়ানোয় চ্যাম্পিয়ন। এরা কেউ কখনও কোনও চোর-ডাকাত বা গুন্ডা-বদমাশকে ধরেনি, ঘাঁটাতেও যায়নি।"

ভারী হতাশ হয়ে অবনী বলে, "তা হলে কী উপায় বলুন তো!"

"ওই দেখো কাণ্ড! জামাইবাবু কি ঘেবড়ে গেলেন নাকি? আপনার খেল দেখব বলেই যে দোগাছি থেকে এত দূর ছুটে এলুম!"

অবনী আমতা-আমতা করে বলে, "সে তো বুঝলুম। কিন্তু আমার যে আর এই অষ্টপুর জায়গাটা মোটেই ভাল লাগছে না!"

"কেন, অষ্টপুর তো দিব্যি জায়গা!"

"অষ্টপুরের চেয়ে আমাদের খিজিরগঞ্জ অনেক ভাল জায়গা মশাই।"

"কেন জামাইবাবু, অষ্টপুরের চেয়ে খিজিরগঞ্জ ভাল কীসে?"

অবনী অনেক ভেবেও খিজিরগঞ্জের ভাল কিছু মনে করতে পারল না। শুধু বলল, "খিজিরগঞ্জের ভোটকচু খুব বিখ্যাত।"

লোকটা হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে বলে, "কচুঘেঁচুর কথাই যদি ওঠে জামাইবাবু, তা হলে বলি অষ্টপুরের মানকচুর কথা সাহেবরাও জানেন। জগদ্বিখ্যাত জিনিস। বছর দশেক আগে এত বড় একটা মানকচু তোলা হয়েছিল যে, সেই জায়গায় একটা সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে গিয়েছে। লোকে দেখতে আসে!"



খেতখামারে কাজ করতে হয় ভুবনকে। খালেবিলে ঘুরতে হয়। সুতরাং সাপখোপের সঙ্গে তার মেলাই দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যায়। কিন্তু সাপ মারে না ভুবন। মারতে নেই। মা মনসার বাহন বলে কথা। আর ভগবানের দুনিয়ায় যা কিছু আছে, সবটাকেই বোধ হয় দরকার।

কিন্তু আজ সাপটাকে মারতে হল বলে ভুবনের ভারী খারাপ লাগছিল। পল্টু পাকড়াশির সন্ধানে কুঁকড়োহাটি থেকে খুব ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়েছিল সে। মোটে দু' মাইল রাস্তা চোখের পলকে পেরিয়ে অষ্টপুরে ঢোকার মুখেই ঘটনা। ভাল করে আলো ফোটেনি তখনও। একটা জঙ্গুলে রাস্তা দিয়ে পোড়োবাড়ি পেরিয়ে আসার মুখে আচমকাই পথ আটকে ফণা তুলল সাপটা। একটু হলেই ঠুকে দিত। বিশেষ ভাবনা-চিন্তা না করেই কুড়ুলটা চালিয়ে দিয়েছিল ভুবন। সাপটা প্রায় দু' আধখানা হয়ে পাশের ঘাসজমিতে ছিটকে পড়ে কিছুক্ষণ কিলবিল করল খুব। তারপর আর নড়াচড়া নেই।

ভুবন তার মায়ের কাছে শুনেছে মা মনসার দোর ধরে তার জন্ম হয়েছিল। মায়ের তাই বারণ ছিল, "সাপ মারিস না বাবা। ওতে বড় পাপ হবে।"

ভুবনের তাই সাতসকালেই বড় মনস্তাপ হচ্ছিল। যে গনগনে রাগ নিয়ে কুড়ুল হাতে সে পল্টু পাকড়াশিকে নিকেশ করতে বেরিয়ে পড়েছিল, সেটা যেন দপ করে নিভে গেল। নিচু হয়ে সাপটাকে



দেখল সে। বড়সড় কালকেউটে। ছোবল মারলে রক্ষে ছিল না। কিন্তু না মারলেও হত। গাঁয়ের মানুষ সে, ভালই জানে মাটিতে চাপড় মারলে বা হাততালি দিলে সাপ বড় একটা ছোবল-টোবল দেয় না, বরং পালায়। কিন্তু আজ মাথাটা বড় গরম হয়ে ছিল, হিতাহিত জ্ঞান ছিল না।

কোমরের গামছায় কপালের ঘাম মুছে ভুবন তাই পাশের একটা গাছতলায় বসল, পাশে রক্তমাখা কুড়ুল। মায়ের দিব্যি দেওয়া ছিল, সেটা আজ সকালে ভঙ্গ হল বলে বড্ড দমে গিয়েছে মনটা। গাছে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে মনটাকে বাগে আনার চেষ্টা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে।

হঠাৎ দেখতে পেল, সামনে একটা খুব ঢ্যাঙা চেহারার লোক দাঁড়িয়ে। তার মাথায় টাক, নাকটা বেজায় চোখা, কটা চোখ, দাড়িগোঁফ কামানো, গায়ে একটা আলখাল্লার মতো, আর হাতে একটা লম্বা ডান্ডায় লাগানো বুরুশ। বলল, "একটা সাপ মারলেই যদি এত মনস্তাপ হয়, তা হলে একটা মানুষ মারলে আরও কত মনস্তাপ হবে, তা ভেবেছ?"

ভুবনের ভাবনা-টাবনা বিশেষ আসে না, তবু তার মনে হল, লোকটা ঠিক কথাই বলছে। সে তবু মিনমিন করে বলে, "কিন্তু সে যে আমার ভাইটাকে মেরেছে।"

"তাই আর একটা ভাইকেও মারতে চাও?"

"তা হলে কী করব?"

"মনে রেখো, যাকে মারতে চাও তাকে প্রভু বড় ভালবাসেন।"

"প্রভু কে?"

"প্রভু যার কাছে যেমন, ঠিক তেমন। মা মনসা হয়ে প্রভু তোমার কাছেই রয়েছেন। আমি তাঁর ভৃত্য।"

মুখে কার একটা গরম শ্বাস পড়ায় চটকা ভেঙে চেয়ে ভুবন

দেখতে পেল, তার সামনে উবু হয়ে বসে একটা লোক জুলজুলে চোখে তাকে দেখছে। তার পরনে একটা হাফপ্যান্ট আর একটা ঢলঢলে জামা। সে চোখ চাইতেই বলল, "উরেব্বাস রে! তুমি তো দোতলা বাড়ির মতো বড় একটা লোক! ঘরদোরের মধ্যে আঁটো কী করে?"

ভুবন একটা হাই তুলে সোজা হয়ে বসল। জবাব দিল না।

লোকটা গলা এক পরদা নামিয়ে বলল, "তা লাশটা কোথায় লুকোলে বলো তো!"

"লাশ! কীসের লাশ?"

লোকটা খুব বুঝদারের মতো একটু খুক করে হেসে বলল, "ভাবছ, আমি রটিয়ে বেড়াব? আমাকে সে বান্দা পাওনি। আমার মুখ দিয়ে কখনও বেফাঁস কথা বেরোয় না বাপু। কথা চেপে রাখতে আমি খুব ওস্তাদ।"

"বটে!"

"তবে! নবকান্তবাবুর গাছ থেকে ট্যাঁপা আর নবু যে আটটা কাঁঠাল চুরি করেছিল, সে কথা কাউকে বলেছি, বলো! হাসু মণ্ডল যে দুর্গা পাইনকে আড়ালে 'কুমড়োপটাশ' বলে, সেটা কখনও ফাঁস করেছি কি? তেজেনবাবুর যে লেজ আছে, তা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। কিন্তু গলা টিপে মেরে ফেললেও সে কথা কাউকে বলব না। বেশি কথা কী, প্রাণপতি দারোগা ফাঁসির আসামি বলে যাকে হাজতে বন্ধ করে রেখেছে, সে যে আসলে পল্টু পাকড়াশি নয়, মাধবগঞ্জের নবীন দাস, সে কথা আমি ছাড়া কাকপক্ষীও কখনও টের পায়নি। বুঝেছ? আরও পাকা কাজ চাও তো দশটা টাকা ফেলে দিয়ো, মুখে স্ক্রু এঁটে যাবে। লাশের খবর কেউ পাবে না।"

ভুবন ছোট চোখ করে লোকটার দিকে চেয়ে বলল, "তা হলে পল্টু পাকড়াশি কোথায়?"

“তার আমি কী জানি!”

ভুবন উঠে পড়ল। কুড়ুলটা কাঁধে ঝুলিয়ে বলল, “অষ্টপুরের থানাটা কোন দিকে বলো তো!”

ঘণ্টাপাগলা অবাক হয়ে বলে, “লাশের কথা কবুল করবে বুঝি! খুব ভাল, খুব ভাল। চলো, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। তা কাকে মারলে বলো তো! নিশাপতি সাধুখাঁকে নাকি? নিশাপতি অতি পাজি লোক। তার পিতলের ঘটি চুরি করেছি বলে জুতোপেটা করেছিল আমাকে। উমেশ কর্মকারকে নয়তো! মেরে থাকলে কিন্তু খারাপ করোনি ভায়া। উমেশের গোয়ালঘর পরিষ্কার করতে রাজি হইনি বলে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়েছিল। মোটে পাঁচ টাকা রেটে কি রাজি হওয়া যায় বাপু? গিরীন সামন্ত হবে কি? বেশ মুশকোমতো কালো বনমানুষের মতো চেহারা গো! বড়-বড় দাঁত! তার বারান্দায় এক রাতে শুয়েছিলুম বলে কী হম্বিতম্বি! কান ধরে ওঠবোস অবধি করিয়েছিল। না হলে কি ধনপতি জোয়ারদার নাকি? ধনপতি হলে খুব ভাল হয়। গুন্ডার সর্দার। বিনি পয়সায় তার সাত জোড়া জুতো বুরুশ করে-করে আমার হাতে ব্যথা...”

প্রাণপতি খাসনবিশের আজ মেজাজ ভাল নেই।

গতকাল সকালে সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, ওই সময় তার মনটা ভারী ফুরফুরে থাকে। মাথায় উচ্চ চিন্তা আসতে থাকে।

তখন সবে সূর্য উঠি-উঠি করছে, গাছগাছালিতে বিস্তর পাখি ডাকছে, শরৎকাল আসি-আসি করছে বলে মিঠে হাওয়া দিচ্ছে, বাগানে ফোটা শিউলির গন্ধটাও আসছে খুব। গোরুর হাম্বা, কুকুরের ঘেউ ঘেউ যেন ভোরবেলাটাকে একেবারে তোল্লাই দিচ্ছিল। চা খেতে খেতে তিনি উচ্চ চিন্তায় উড়ে যাওয়ার জন্য তৈরিও হচ্ছিলেন। চিন্তার বিষয়টাও শানিয়ে রেখেছিলেন। একের

সঙ্গে এক যোগ করলে হয় দুই। তাই যদি হবে, তা হলে এই যে চারদিকে যা সব রয়েছে, বাড়িঘর, গাছপালা, হাঁস-মুরগি, গোরু-বাছুর, রোদ-আকাশ এসব যোগ করলে যোগফল কী হবে। রোদের সঙ্গে হাওয়া যোগ দিলে কী দাঁড়ায়?

সবে ভাবনা শুরু করতে যাবেন, ঠিক এমন সময় দেখতে পেলেন ফটকের বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। লোকটা বেজায় লম্বা, মাথায় টাক, কটা চোখ, পরনে একটা আলখাল্লার মতো জিনিস।

তিনি হেঁকে বললেন, "কে ওখানে? কী চাই?"

লোকটা একটাও কথা না বলে পিছু ফিরে চলে গেল। একজন সেপাইকে ডেকে লোকটার খোঁজ করতে পাঠালেন। ঘণ্টা খানেক পর ফিরে এসে সে বলল, "আজ্ঞে বড়বাবু, কোথাও পাওয়া গেল না।"

সেই থেকে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। উচ্চ চিন্তায় উড়ি-উড়ি করেও উড়তে পারলেন না।

কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হল না। সকালে বাজারে যাওয়ার সময় টের পেলেন, কেউ যেন তাঁর পিছু নিয়েছে। একবার চকিতে পিছু ফিরে যেন দাড়িগোঁফওলা একটা লোককে চট করে একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিতেও দেখলেন।

বাজার করতে করতেও সারাক্ষণ মনে হতে লাগল, তাঁকে কেউ নজরে রাখছে, তাঁর গতিবিধি লক্ষ করছে। অথচ তিনি অষ্টপুরের বড়বাবু, বলতে গেলে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এত সাহস কার যে, তাঁর উপর নজর রাখে?

এতে হল কী, সারাদিন তাঁর আর উচ্চ চিন্তা হল না।

উচ্চ চিন্তা না হলে প্রাণপতিবাবুর নানা রকম অসুবিধে হতে থাকে। অনিদ্রা হয়, হাই ওঠে, অরুচি হয়, নাক চুলকোয় এবং

হাত-পা নিশপিশ করে। আজ সকালবেলায় কালকের মতোই পাখি ডাকছিল, শিউলির গন্ধ ছড়াচ্ছিল, গোরুর হাম্বা, কুকুরের ডাক কোনও কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু প্রাণপতিবাবুর মনে হচ্ছিল, এমন বিটকেল সকাল আর দেখেননি, শিউলির কী বিচ্ছিরি গন্ধ, পাখিগুলো যে কেন এত চেঁচায় আর চা জিনিসটা যে কেন আহাম্মকরা খায়?

বাজারের দোকানিরা তাঁকে যথেষ্টই খাতির করে। ন্যায্য দামই নেয়, ওজনেও ঠকায় না। কিন্তু আজ বাজার করতে গিয়ে তাঁর খুব ইচ্ছে করছিল, মাছওলা বিনোদকে একটা ঘুসি মারেন। কালুরামের মুদিখানায় ডাল আর সর্ষের তেল কেনার সময় তাঁর খুব ইচ্ছে হল, কালুরামকে বেত মারতে মারতে থানায় নিয়ে হাজতে পুরে রাখেন। আর লাউ কেনার সময় সবজিওলা কেনারামকে বিনা কারণেই তিনি 'গাধা', 'গোরু' ও 'রাসকেল' বলে গালাগাল করে বসলেন। এবং করে মনে হল, 'বেশ করেছি। ওদের উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার।'

একটু বেলার দিকে যখন থানায় এসে বসলেন, তখন তাঁকে কেউই যেন ঠিক চিনতে পারছিল না। রোজকার যেই ভোলাভালা, আনমনা ভালমানুষের জায়গায় যেন দারোগার চেয়ারে একটা ভালুক বসে আছে। চোখদুটো ভাঁটার মতো চারদিকে ঘুরছে। কথায় কথায় রুলটা তুলে ঠকাস করে টেবিলে ঘা মারছেন। কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না।

ঠিক এই সময় ঘণ্টাপাগলা গ্যালগ্যালে হাসিমুখে ঘরে ঢুকে একটা সেলাম ঠুকে বলল, "গুড মর্নিং, বড়বাবু। ব্রিং এ মার্ডারার। এই আজ সকালেই ফস্টারসাহেবের বাড়ির কাছে একজনকে খুন করে এসেছে হুজুর। এই যে, একেবারে হাতেনাতে ধরে এনেছি... কই হে, এসো..."

ঘণ্টার একটু পিছনে যে লোকটা ঘরে ঢুকল সে দেড় মানুষ লম্বা,

তেমনি পেল্লায় পেটানো চেহারা। কাঁধে লটকানো একটা কুডুল এবং তাতে বাস্তবিক রক্তের দাগ।

প্রাণপতি একটা হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, "কাকে খুন করেছিস?"

লোকটা একটু হেসে হাত তুলে বরাভয় দেখিয়ে বলল, "ব্যস্ত হবেন না বড়বাবু। খুন-টুন করে আসিনি। পথে একটা কেউটে সাপের মুখে পড়ে গিয়েছিলাম, সেটাকেই মারতে হয়েছিল।"

ঘণ্টাপাগলা ভারী ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, "খুন করোনি মানে? তুমি যে বললে, নিশাপতি না হয় তো উমেশ, গিরীন সামন্ত কিংবা ধনপতি, কাকে যেন মেরেছ?"

প্রাণপতি একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে বললেন, "চোপ!"

ঘণ্টা ধমকের শব্দে আঁতকে উঠল।

প্রাণপতি বললেন, "এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই একটু আগে আমার বাজারে দেখা হয়েছে। কিন্তু তুমি কে হে বাপু? কী চাও?"

দৈত্যটা হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে, আমার নাম ভুবন মণ্ডল। পল্টু পাকড়াশির হাতে আমার ছোট ভাই খুন হয়। শুনেছি পল্টু সদরের জেল থেকে পালিয়েছে। তাকে খুঁজতেই আসা।"

"আর খুঁজতে হবে না। সে আমাদের হেফাজতেই আছে। শিগগিরই সদর থেকে ফোর্স এসে তাকে নিয়ে যাবে।"

"একটু কথা আছে হুজুর। এই পাগলাটা বলছে, আপনাদের হেফাজতে যে আছে সে নাকি পল্টু পাকড়াশি নয়, অন্য লোক!"

"হুঁ, আসামি নিজেও তাই বলছে। সে নাকি নবীন দাস। ফুঃ!"

"হুজুর যদি অনুমতি করেন, তা হলে একবার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে যাই।"

প্রাণপতি এমন কটমট করে তাকালেন যে, ভুবন মণ্ডল জড়সড় হয়ে এক ফুটের মতো বেঁটে হয়ে গেল। প্রাণপতি ফোঁস করে একটা

রাগের হলকা শ্বাস ফেলে বললেন, "কোনওরকম চালাকি করার চেষ্টা করলে কিন্তু সুবিধে হবে না বাপু।"

"আজ্ঞে না হুজুর, আপনার সঙ্গে বেয়াদপি করব, আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা?"

ঘণ্টাপাগলা দারোগাবাবুকে যত দেখছে, ততই ধন্ধে পড়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ মাথাটাথা চুলকে হঠাৎ একগাল হেসে বলল, "এইবার বুঝতে পেরেছি।"

প্রাণপতি ভ্রু কুঁচকে করাল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, "কী বুঝতে পেরেছিস?"

"আপনি যে তিনি নন!"

প্রাণপতি ফুঁসে উঠে বললেন, "তার মানে?"

"প্রাণপতি খাসনবিশ বদলি হয়ে গিয়ে আপনি নতুন দারোগাবাবু এসেছেন তো! এটাই এতক্ষণ বুঝতে পারিনি মশাই। তবে কেমন যেন মনে হচ্ছিল, ইনি আমাদের সেই ভালমানুষ দারোগাবাবুটি নন। এই এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।"

প্রাণপতি ক্রূর দৃষ্টিতে ঘণ্টার দিকে চেয়ে বললেন, "হুঁ, কথাটা যেন মনে থাকে। আমি আর সেই আমি নই।"

এরপর প্রাণপতি ভুবন মণ্ডলের দিকে চেয়ে বললেন, "কুড়ুল বড় ভাল জিনিস নয়। কাজে লাগে, অকাজেও লাগে।"

"যে আজ্ঞে।"

"কুড়ুলখানা দরওয়াজার কাছে জমা দিয়ে তুমি আসামিকে দেখে আসতে পারো। যাবে আর আসবে। মনে থাকে যেন।"

আজ প্রাণপতির বজ্রগম্ভীর গলায় থানা যেন গমগম করতে লাগল। ভুবন মণ্ডল তটস্থ হয়ে একটা পেন্নাম ঠুকে ফেলল। এরকম জবরদস্ত দারোগা সে জন্মেও দেখেনি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এসে ভুবন মণ্ডল বলল, "হুজুর, মা

মনসার দিব্যি কেটে বলতে পারি, এ লোক কস্মিনকালেও পল্টু পাকড়াশি নয়। চেহারার মিল আছে বটে, কিন্তু পল্টু পাকড়াশির চোখ দেখলে সাপ পর্যন্ত পথ ছেড়ে দেয়।"

"কিন্তু প্রমাণ?"

মাথা নেড়ে ভুবন মণ্ডল বলে, "প্রমাণ নেই হুজুর। তবে একে ফাঁসি দিলে বড় অধর্ম হবে।"

চিন্তিত প্রাণপতি গম্ভীর ভাবে শুধু বললেন, "হুঁ।"

ঘণ্টা খানেক বাদে তাঁর বাড়ি থেকে খবর এল, তাঁর মেয়ে আট বছরের মধুছন্দা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরেনি। কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাণপতির স্ত্রী বিজু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে এসে তিনি দেখেন, পাড়াপ্রতিবেশীদের ভিড়ে বাড়ি গিজগিজ করছে। ভিড়ের ভিতর থেকে একজন এগিয়ে এসে একটা ভাঁজ করা কাগজ প্রাণপতিকে দিয়ে বলল, "এটা বউদির মুঠোয় ধরা ছিল।"

এক্সারসাইজ বুক থেকে ছেঁড়া পাতায় বিচ্ছিরি হাতের লেখায় একখানা চিঠি। তাতে লেখা,

মাননীয় মহাশয়, নিতান্ত অপারগ হইয়া আপনার কন্যাকে অপহরণ করিতে হইল। আমাদের শর্ত হইল, আজ রাত বারোটায় আপনি আপনার থানার তেরো নম্বর আসামি পল্টু ওরফে মৃগেন পাকড়াশিকে মুক্তি দিবেন। অন্যথায় আপনার কন্যার ভালমন্দের দায়িত্ব আমরা লইতে পারিব না। আমাদের প্রস্তাবে আপনি সম্মত হইলে আপনার সামনের বারান্দায় একটা লাল গামছা বা কাপড় টাঙাইয়া দিবেন।

প্রাণপতির আজ কী হয়েছে, তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না। মাথাটা বেশ কাজ করছে। এ যেন ঠিক তিনি নন, অন্য কেউ। তিনি চট করে একখানা লাল রঙের গামছা বাইরের বারান্দায়

টাঙিয়ে দিয়ে সকলের দিকে চেয়ে বললেন, "একটা লম্বাপানা টাক মাথার লোক, কটা চোখ, গায়ে একটা আলখাল্লার মতো পোশাক, তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তাকে খুঁজে বের করা খুব জরুরি। এই কাণ্ডর মূলে সেই লোকটার হাত আছে।"

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, জুলজুলে চোখ, রোগা চেহারা, লুঙ্গি আর কামিজ পরা একটা লোক এগিয়ে এসে বলল, "তাকে খুঁজছেন কেন বড়বাবু?"

"সে-ই যত নষ্টের গোড়া।"

উদ্ধব খটিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নেড়ে বলে, "আজ্ঞে, তাঁকে কি কেউ খুঁজে পাবে হুজুর?"

"তার মানে? তুমি কি তাকে চেনো?"

উদ্ধব মাথা চুলকে বলে, "যাঁর কথা বলছেন তাঁর সঙ্গে একজনেরই মিল আছে হুজুর। তিনি বড় ভাল লোক।"

"কিন্তু লোকটা কোথায়, তাকে ধরে আনো।"

হরেন চাটুজ্যের মা মৃদুভাষিণী দেবী এগিয়ে এসে বললেন, "ও বাবা প্রাণপতি, তুমি কাকে খুঁজছ বলো তো?"

"সে একজন কটা চোখের ঢ্যাঙা লোক মাসিমা, মাথাজোড়া টাক, ফর্সা রং আর গায়ে আলখাল্লা গোছের পোশাক।"

"সে কী করেছে বাবা?"

"এই তো গত কালই সকালবেলায় এসে আমাদের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার উপর নজর রাখছিল।"

মৃদুভাষিণী মাথা নেড়ে বললেন, "তাকে খোঁজবার আর দরকার নেই বাবা। সে নিজেই তোমাকে ঠিক খুঁজে নেবে। ভেবো না। খুঁজলেও তাকে অত সহজে পাওয়া যাবে না।"

"আপনিও কি তাকে চেনেন মাসিমা?"

“চিনি বাবা। আমি চিনি, ওই উদ্ধব হতভাগা চেনে। তুমিও চিনতে পারবে। তবে এমনিতে চেনা বড় মুশকিল। দেখা পাওয়া আরও মুশকিল।”

“এ যে হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে মাসিমা!”

মৃদুভাষিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, “হেঁয়ালিই মনে হয় বাবা। এ যুগে কি আর ওসব কেউ বিশ্বাস করে?”



দু’ দিন হল অবনী ঘোষালের স্নান-খাওয়া নেই। না না, কথাটা ভুল হল। স্নান আছে, খাওয়া নেই। দুশ্চিন্তায় এবং দুর্ভাবনায় মাথাটা মাঝে-মাঝেই বড্ড গরম হয়ে যাচ্ছে বলে এই শরতের শুরুতে অষ্টপুরে একটু একটু ঠান্ডা পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও অবনী দিনে পাঁচ থেকে সাতবার ঠান্ডা জলে স্নান করছে। কিন্তু খেতে বসলেই মনে হয়, তার পাকস্থলীতে হরতাল চলছে, কণ্ঠনালীতে চলছে পথ অবরোধ। তেলালো মাছের কালিয়া, মুরগির মোগলাই, মুড়ো দিয়ে সোনামুগের ডাল, মুড়িঘণ্ট, বিরিয়ানি বা পায়েস সব গলা পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে আসছে। তাঁর অরুচি দেখে শাশুড়ি আর্তনাদ করছেন, শ্বশুর দুশ্চিন্তায় ছাদে পায়চারি করছেন, তাঁর স্ত্রী তাঁকে কোষ্ঠ পরিষ্কারের ওষুধ গেলাচ্ছে। কিন্তু অবনীই একমাত্র জানে তার অরুচি কেন। কিন্তু কারণটা কাউকে লজ্জায় বলতেও পারছে না সে। নতুন জামাইকে যদি সবাই ভিতু ভাবে, তা হলে বড় লজ্জার কথা। এই তো মাত্র তিনদিন আগে সে অত বড় একটা বীরত্বের কাজ করেছে। সুখ্যাতিও হয়েছে মেলাই। সেই

বেলুনটা চুপসে গেলে সে কি আর কোনওদিন শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারবে?

কিন্তু প্রাণের মায়া বড় মায়া। ক'দিন আগেও অষ্টপুরকে তার বড় ভাল লাগত। এখন মনে হচ্ছে, অষ্টপুরই যত নষ্টের গোড়া। নিতান্ত আহাম্মক ছাড়া অষ্টপুরে কেউ মরতে বিয়ে করতে আসে? বরং কেষ্টপুরে বিয়ে করলেই ভাল হত। অবনী রাতে চোখ বুজলেই দেখতে পায়, অষ্টপুরের গুন্ডা-বদমাশরা তাকে ঘিরে ধরে ডান্ডাপেটা করছে, রড দিয়ে হাত-পা ভাঙছে, চপার দিয়ে কোপাচ্ছে, দা দিয়ে টুকরো টুকরো করছে। সে আরও দেখতে পায়, তার বউ সজল চোখে তাকে বিদায় জানাচ্ছে আর বলছে 'যেতে নাহি দিব', তারপর অষ্টপুর শ্মশানে...ওঃ, আর ভাবতে পারে না অবনী। মাথা ঠান্ডা করতে মাঝরাতে উঠেও চান করতে হয় তাকে।

নিশুত রাতে জেগেই ছিল অবনী। দু' দিন হল, ঘুমের সঙ্গে তার মুখ দেখাদেখি বন্ধ। শুনশান মধ্যরাতে উঠে বসে তার মনে হল, অষ্টপুরের গুন্ডা-বদমাশদেরও কি আর রাতের ঘুম বা বিশ্রাম বলে কিছু নেই? নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং এই সময়ে যদি কালো পোশাকে, মুখে একটা কিছু ঢাকা-চাপা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে, তা হলে কেমন হয়? রিস্ক হয়তো একটু আছে, কিন্তু ওখানে বসে থেকে মৃত্যুর প্রহর গোনার চেয়ে এটুকু বিপদের ঝুঁকি নেওয়াই উচিত।

অবনী সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না। মালপত্র আছে থাক। সকালে উঠে তাকে খুঁজে না পেলে শ্বশুরবাড়ির লোক এবং তার বউ দুশ্চিন্তা করবে সন্দেহ নেই। হয়তো ভাববে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে, হয়তো ভাববে অপহরণ। কিন্তু সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই তার। প্রাণ আগে, না লৌকিকতা আগে?

কালো না হলেও কালচে রঙের প্যান্ট-শার্ট পরে নিল অবনী।

একটা মাফলার দিয়ে মুখ ঢেকে নিল। তারপর চুপিসারে দোতলা থেকে নেমে কম্পিত বক্ষে ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল। বারান্দায় শ্বশুরমশাইয়ের কয়েক গাছা লাঠি একটা স্ট্যান্ডে রাখা ছিল। তা থেকে একটা বেশ মজবুত লাঠিও সঙ্গে নিল সে। বিপদে পড়লে খানিকটা কাজে দেবে।

বাইরে নিকষ্যি অন্ধকার। অবনী নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অন্ধকার হলেও রাস্তার একটা আন্দাজ আছে অবনীর। বাঁ হাতে খানিক হেঁটে ডান ধারে মোড় ফিরে গির্জা পর্যন্ত গেলেই বাঁ ধারে নীলকুঠির জঙ্গল। ফস্টারসাহেবের বাড়ির ধার ঘেঁষেই গাঁয়ের বাইরে যাওয়ার রাস্তা। নিরিবিলি আছে, লোকজনের যাতায়াত বিশেষ নেই ওদিকে। মাইল দুই পথ মেরে দিলেই কুঁকড়োহাটি। তারপর আর পায় কে অবনীকে! বগল বাজিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে সে। এই পথটুকুই যা দুশ্চিন্তার।

অন্ধকার বলে পা চালিয়ে চলবার উপায় নেই। মোড় বরাবর যেতেই অনেকটা সময় গেল। তারপরও ঘাপটি মেরে থাকতে হল কিছুক্ষণ। রাতপাহারায় চৌকিদাররা হুইসল বাজিয়ে ডান ধার থেকে বাঁ ধারে গেল। রাস্তা ফাঁকা বুঝে সাবধানে মোড় পেরিয়ে ডান দিকের রাস্তা ধরল অবনী।

ভারী বিনয়ী গলায় পাশ থেকেই কে যেন বলে উঠল, "জামাইবাবু কি মর্নিং ওয়াকে বেরোলেন নাকি?"

মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা সাপ নেমে গেল অবনীর। হাত-পা ঠান্ডা। শরীর কাঠ। তোতলাতে তোতলাতে কোনওক্রমে বলল, "না, এই একটু..."

"বড্ড হুটোপাটি করে বেরিয়ে পড়েছেন মশাই, এই তো



থানার ঘড়িতে মোটে রাত দুটো বাজল। এই সময়ে সব চোর-ছ্যাঁচড়রা বেরোয়। এই তো দেখে এলুম, গড়ান সাধুখাঁ পালপাড়ার গৌরহরিবাবুর ঘরের গ্রিল কাটছে। পবন সাউ চৌপথীর কাছে পাইপ বেয়ে গিরিধারীবাবুর দোতলায় উঠছে। বিপিন দাসকে তো দেখলুম সুখেন গোসাঁইয়ের বাড়ি থেকে এককাঁড়ি বাসনকোসন আর একগাদা জামাকাপড় নিয়ে পিছনের জানলা গলে বেরিয়ে এল। নিতাই মোদক বাজারের মহাজনের গুদোমে এই বড় সিঁদ কেটে ফেলেছে।"

গলাটা চিনতে পেরে একটু ধাতস্থ হল অবনী। ভয়ের তেমন কিছু নেই, এ হল ঘণ্টাপাগলা। একটা নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে সে বলল, "তা তুমি ঘুমোওনি?"

ঘণ্টা অবাক হয়ে বলে, "আমি ঘুমোব কী মশাই, আমার কি ঘুমোলে চলে? এই গোটা অষ্টপুর তা হলে দেখাশোনা করবে কে? আমি ছাড়া আর কার গরজ আছে বলুন। সব কিছু তো আমাকেই দেখেশুনে রাখতে হয়!"

"তা অবশ্য বটে।"

"এই গোটা অষ্টপুরের সব খবর আমার নখদর্পণে। কোন গাছের ক'টা পাতা খসল, ক'টা গজাল, নন্দবাবুর গোরুটা যে বাছুর বিয়াল, সেটা এঁড়ে না বকনা, শচীপিসির বাঁ হাঁটুতে বাত না ডান হাঁটুতে, পোস্ত খেলে যে পাঁচকড়ির পেটে ব্যথা হয়, এসব খবর আর কে দেবে আপনাকে বলুন তো!"

"তাই তো হে! এসব গুরুতর খবর তো আমার জানা ছিল না।"

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘণ্টা বলল, "তবু অবিচারটা দেখুন, অষ্টপুরে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু আমিই টের পেলুম না।"

“কী ঘটনা বল তো!”

“প্রাণপতি দারোগার জায়গায় যে নতুন দারোগা এসেছে জামাইবাবু।”

“তাই নাকি?”

“কেমন নরমসরম ভোলাভালা দারোগাটা ছিল আমাদের। তার বদলে এসেছে এক বদরাগী, মারমুখো দারোগা। কটমট করে তাকায়, দাঁত কড়মড় করে কথা কয়, গাঁক গাঁক করে চেঁচায়।”

“তা হলে তো ভয়ের কথা!”

“আজ্ঞে, খুবই ভয়ের কথা। তবে কিনা অষ্টপুরে ভয়-ভীতির অনেক জিনিস আছে। কিন্তু ভয় পেলে কি আমার চলে বলুন! তা হলে অষ্টপুরের দেখাশুনো করতে পারতুম কি?”

“সে তো ঠিকই।”

“তা জামাইবাবু, একটা কথা বলব?”

“বলে ফ্যালো।”

“আপনি কেন লাঠি হাতে নিশুতি রাতে বেরিয়ে পড়েছেন, তা কিন্তু আমি জানি।”

অবনী একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, “কী বলো তো!”

“আপনি চোর-ডাকাত ধরতে বেরিয়েছেন, তাই না? অষ্টপুরের সবাই বলে, আচার্যিবাবুর ছোট জামাইটা খুব বাহাদুর আছে।”

অবনী আঁতকে উঠে বলে, “ওরে বাবা! না হে বাপু, আমি মোটেই চোর-ডাকাত ধরতে বেরোইনি। ও কথা শোনাও পাপ। আমি বাপু, একটু হাওয়া খেতেই বেরিয়েছি।”

“আপনার সঙ্গে আমার খুব মিল। আমারও ভয়ডর নেই কিনা।”

“না হে বাপু ঘণ্টা, আমার মোটেই তোমার মতো সাহস নেই।”

"কী যে বলেন জামাইবাবু, সবাই জানে আপনি অষ্টপুরের সব গুন্ডা-বদমাশদের একদিন ঠান্ডা করে দেবেন।"

"ওরে বাপ রে, ও কথা বলতে নেই হে ঘণ্টা। অষ্টপুর খুব ভাল জায়গা। এখানে মোটেই গুন্ডা-বদমাশ নেই। আমি বরং এগিয়ে যাই, একটু তাড়া আছে হে।"

ঘণ্টা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, "আপনি কিছু ভাববেন না জামাইবাবু, আমি আপনাকে অষ্টপুরের সব ক'টা চোর-ডাকাত-গুন্ডা আর বদমাশকে চিনিয়ে দেব।"

অবনী দু' হাতে দু' কান চাপা দিয়ে একরকম দৌড়তে লাগল। অষ্টপুরে আর তিলার্ধ থাকা চলবে না। সামনে বড়ই বিপদ। কী কুক্ষণে যে ঘণ্টার সঙ্গে দেখা হয়েছিল!

কোন কয়েদির না ছাড়া পেতে ভাল লাগে? বিশেষ করে ফাঁসির আসামির!

কিন্তু রাত বারোটার একটু আগে যখন প্রাণপতি, পল্টু পাকড়াশি ওরফে নবীন দাসের লকআপে গিয়ে উঁকি দিলেন, তখন নবীন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

প্রাণপতি গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী খবর হে পল্টু?"

ছেলেটা তাঁর দিকে চেয়ে কাঁপা গলায় বলল, "বড়বাবু, আমাকে বাঁচান। পল্টু পাকড়াশি, চণ্ডী আর বগা তিনজন আমাকে খুন করতে এসেছে। একটু আগেই আমার আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে এসে দেখে গিয়েছে আমায়।"

"পল্টু পাকড়াশি! সে তো তুমিই হে!"

"না বড়বাবু। আমি তো নকল পল্টু। আমি আসল পল্টুর কথা বলছি।"

"তুমি আসল নও?"

"আজ্ঞে, না বড়বাবু। আমি মাধবগঞ্জের নবীন দাস। সবাই জানে।"

"বগা আর চণ্ডী কে?"

"তারা নগেন পাকড়াশির লোক।"

"তারা তোমাকে মারতে চায় কেন?"

মাথা নেড়ে নবীন বলে, "তা জানি না। পল্টুর চোখ দেখে আমি বড় ভয় পেয়েছি বড়বাবু। আমার বড় শীত করছে। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে।"

প্রাণপতি গম্ভীর হয়ে বললেন, "হুঁ, বুঝলাম। কিন্তু পল্টুর হাত থেকে বাঁচলেও ফাঁসির দড়ি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

নবীন হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"কাঁদলে কি বাঁচতে পারবে?"

গারদের চাবিটা খুলে প্রাণপতি বললেন, "উঠে এসো। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

কম্বল মুড়ি দিয়েই উঠে এল নবীন। তাকে মুখোমুখি চেয়ারে বসিয়ে প্রাণপতি বললেন, "ওই তিনজনের মধ্যে একজন কি খুব লম্বা, রোগাপানা, মাথায় টাক, চোখদুটো কটা আর গায়ে আলখাল্লার মতো পোশাক?"

নবীন অবাক হয়ে বলল, "না তো!"

"ভাল করে ভেবে বলো।"

"আজ্ঞে না। ওদের মধ্যে ওরকম লোক কেউ নেই।"

"এরকম চেহারার কোনও লোককে চেনো?"

নবীন একটু ভেবে বলল, "চিনি না। তবে সেদিন ওরকম চেহারার একজনকে গির্জা ঝাঁট দিতে দেখেছিলাম।"

"গির্জা!"

"হ্যাঁ। শীতলসাহেবের গির্জা।"

"ওই গির্জা বহুকাল ব্যবহার হয় না। পুরনো ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে বলে বন্ধ রয়েছে। বিপজ্জনক বাড়ি, যে-কোনওদিন ভেঙে পড়তে পারে। ওই গির্জায় কে ঝাঁট দিতে আসবে!"

নবীন মাথা নেড়ে বলে, "আমি অতশত জানি না। গির্জার দরজাটা একটু ফাঁক করেছিলাম, তখন দেখি, ঠিক ওইরকম চেহারার একজন লোক খুব যত্ন করে ডান্ডি লাগানো বুরুশ দিয়ে ধুলো-ময়লা সাফ করছে।"

"খুবই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। এরকম ঘটার কথা নয়। ওই গির্জায় কেউ থাকে না। তবে পুরনো গির্জা ভেঙে আবার নতুন করে গির্জা তৈরির তোড়জোড় চলছে। তুমি ভুল দেখোনি তো!"

"কী জানি বড়বাবু, ভুলও দেখতে পারি। তখন ভয়ে, দুশ্চিন্তায় মাথার কি ঠিক ছিল?"

"মুশকিল হল, এই গাঁয়ের আরও দু'জন মানুষও লোকটাকে দেখেছে। লোকটা কে হতে পারে তাই ভাবছি। এখন তোমাকে যা বলছি, তা মন দিয়ে শোনো।"

"আজ্ঞে, বলুন।"

"তোমাকে আজ রাত ঠিক বারোটায় আমি ছেড়ে দেব।"

"ছেড়ে দেবেন! বাপ রে! তা হলে যে ওরা আমাকে জানে মেরে দেবে বড়বাবু!"

হোঁচট খেয়ে গদাম করে একটা আছাড় খাওয়ার পর সংবিৎ ফিরে পেল অবনী। এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে অচেনা জায়গায় দৌড়নো তার ঠিক হয়নি। পড়ে গিয়ে হাঁটু জ্বালা করছে, হাতের তেলো ছড়ে গিয়েছে এবং মাথাটাও ঝিমঝিম করছে। সে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে একটু কষ্ট করেই উঠে দাঁড়াল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিপজ্জনক অষ্টপুর ছেড়ে তার না পালালেই নয়। কিন্তু দৌড় দিতে গিয়ে এবং

আছড়ে পড়ে তার মাথা গুলিয়ে গিয়েছে। কোন দিকে যাবে, তা বুঝতে পারছে না।

পিছনে কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কি? একটু কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল অবনী। হ্যাঁ, পায়ের শব্দই বটে। একজন নয়, অন্তত তিন-চারজনের।

অবনীর আর দাঁড়ানোর সাহস হল না। সে ফের ছুটবার একটা মরিয়া চেষ্টা করল। এবং টের পেল সে একটা জংলা জায়গায় ঢুকে পড়েছে। জঙ্গল এক রকম মন্দ নয়। তাতে খানিক আড়াল হবে। কিন্তু জায়গাটায় খানাখন্দ আছে। দু'-তিনবার ছোট ছোট গর্তে পা পড়ে গেল।

একটু ঘন গাছপালার আবডাল পেয়ে দাঁড়াল অবনী। পিছনে যারা আসছিল, তারা আরও কাছে এসে পড়েছে। তাদের হাতে টর্চ জ্বলছে এবং নিভছে। কাছাকাছি আসবার পর অবনী দেখল, তিনটে লোক একজন লোককে ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। দৃশ্যটা ভারী অস্বস্তিকর। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, লোক তিনটের মতলব ভাল নয়।

সেটা আরও ভাল করে বোঝা গেল, টর্চের আলোয় একজনের হাতে একটা ছোরা ঝিকিয়ে উঠবার পর।

না, অষ্টপুর জায়গাটা সত্যিই যাচ্ছেতাই। ভদ্রলোকের বসবাসের যোগ্য নয়। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখাটা ঠিক হবে কি না সেটাই ভাবতে লাগল অবনী।

লোকগুলো মাত্র কয়েক হাত দূর দিয়ে ডানধারে চলে যাচ্ছিল। অবনী শুনতে পেল, কে যেন কাতর স্বরে বলছে, "আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমার তো ফাঁসিই হবে।"

জবাবে কে যেন বলল, "ফাঁসির আগে যে অনেক কথা ফাঁস হয়ে যাবে বাবা।"

টর্চের আলোয় ছেলেটার মুখটাও এক ঝলক দেখতে পেল অবনী। সর্বনাশ! এ তো সেই পল্টু পাকড়াশি! অবনীর বীরত্বে যে হাটুরে মার খেয়ে ধরা পড়েছিল! না! আর এক মুহূর্তও অষ্টপুরে নয়। জীবনে সে আর কোনও বীরত্বের কাজও করতে যাবে না। আর অষ্টপুরের গুন্ডারা যতদিন না তাকে ভুলে যায়, ততদিন অবনী অষ্টপুরে আসবেও না। গুন্ডাগুলো যেদিকে গেল, তার উলটোবাগে পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগল অবনী।

থানা থেকে বেরিয়ে নিজের গাঁয়েই ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছিল ভুবন। কিন্তু পল্টু পাকড়াশি যে ধরা পড়েনি, এই চিন্তাটাও বড় উচাটন করছিল তাকে। আজকের দিনটা ভাল নয়। প্রাতঃকালেই মা মনসার জীবটাকে মারতে হল। কী হয় কে জানে।

উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে ভুবন একটা নিরিবিলি জায়গায় পুরনো শ্যাওলাধরা গির্জা দেখতে পেয়ে দাঁড়াল। জরাজীর্ণ অবস্থা বটে, কিন্তু নোংরা নয়। সে পায়ে-পায়ে গিয়ে সামনের ছোট্ট চাতালটায় বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

মেজাজটা ভাল নেই ভুবনের। সকালে যে স্বপ্নটা দেখল, তারও মাথামুন্ডু বুঝতে পারেনি সে। স্বপ্নটপ্ন বড় একটা দেখে না ভুবন। সারাদিন খেতখামারে অসুরের মতো খেটেপিটে এসে এক থালা ভাত মেরে দিয়ে মোষের মতো ঘুমোয়। বহুদিন পর আজ স্বপ্ন দেখল। লম্বা একটা টেকো লোক কী সব ভাল ভাল কথা বলছিল যেন! কিন্তু ভাল কথা দিয়ে কি জীবন চলে! কিন্তু তার সন্দেহ হচ্ছে, স্বপ্নটার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার কিছু যোগাযোগও থাকতে পারে। তবে বড্ড গোলমেলে ব্যাপার। পল্টুর বদলে অন্য একটা লোককে ধরে আটকে রাখা হয়েছে কেন, তাও সে বুঝতে পারছে না। পল্টু কি তা হলে পালিয়েছে? ভুবন জানে, তার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। সে একজন

বোকা চাষা মাত্র। ভাবনাচিন্তা তার আসে না। সেই অনভ্যাসের কাজটা করতে গিয়ে তার মাথাটাই গুলিয়ে যাচ্ছে।

মিঠে হাওয়া দিচ্ছিল খুব। চারদিকে গাছগাছালির ঝিরিঝিরি ছায়া। শরীরেরও ধকল গিয়েছে মন্দ নয়। ভুবন ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখে, সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে তাকে খুব ঠাহর করে দেখছে। মুখে দাড়িগোঁফ আছে, রোগাপানা, পরনে লুঙ্গি আর কামিজ। তাকে চোখ চাইতে দেখে বলল, "নতুন লোক দেখছি যে!"

ভুবন একটা হাই তুলে শুধু বলল, "হুঁ।"

"অষ্টপুর গাঁয়ে বাইরের মানুষের আনাগোনা বিশেষ নেই। গতকাল থেকে দেখছি, খুব বাইরের লোক এসে ঢুকে পড়েছে।"

ভুবন বলে "কেন, বাইরের লোক এলে কী হয়?"

লোকটা সিঁড়ির একটা ধাপে বসে কাঁধের গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলে, "ভালটা কী হচ্ছে বলো! এই তো আজ সকালে দারোগাবাবুর মেয়েটা চুরি হয়ে গেল।"

ভুবন সটান হয়ে বসে বলল, "অ্যাঁ!"

"তবেই বোঝো, বাইরের লোকের আনাগোনা হচ্ছে কেন।"

"কে চুরি করল?"

"সে কি আর তার নাম, ধাম, ঠিকানা লিখে রেখে গিয়েছে বাপু?"

ভুবন খুব চিন্তিত মুখে বলল, "হুঁ।"

"তোমার কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?"

"তা দূর আছে।"

"মতলব কী?"

"একজনের খোঁজ করতে আসা। তার নাম পল্টু পাকড়াশি।"

"ও বাবা! সে তো শাহেনশা লোক! দেখা পেলে?"



মাথা নেড়ে ভুবন বলে, “না। থানায় যে আটক আছে, সে পল্টু নয়। পল্টু কাছেপিঠে থাকলে পাপের গন্ধ পাওয়া যায়।”

“গন্ধটা কি পাচ্ছ?”

“মনে হয় পাচ্ছি।”

“তা হলে চলো, কাছেই আমার কুঁড়ে। পান্তা চলে তো?”

“পান্তা খেয়েই তো এত বড়টি হলুম।”

“তা হলে চলো।”

বিশু গায়েন নিজের চোখকে বিশ্বাস করবে কি না ভেবে পাচ্ছিল না। পাকা খবর পেয়েই এসেছে যে, পল্টু পাকড়াশি অষ্টপুর থানায় ধরা পড়ে আটক রয়েছে। সদর থেকে পুলিশ ফোর্স আসছে তাকে নিয়ে যেতে। তবু সন্দেহের শেষ রাখতে নেই বলে, সে অষ্টপুরে এসে তার খাতক মহাদেব সরকারের গদিতে উঠেছে।

সব শুনে মহাদেব বলল, “তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার জামাইয়েরও খুনি ধরা পড়েছে, ফাঁসিতে সে ঝুলবেই। আমাদের চোখের সামনেই তো ঘটনাটা ঘটল। অবনী ঘোষালের মানিব্যাগ চুরি করে ধরা পড়ল, তারপর সে কী হাটুরে মার বাবা! মরেই যাওয়ার কথা। কিন্তু মরতে মরতেও জোর বেঁচে গিয়েছে।”

বিশু গায়েনের ধন্ধটা এখানেই। পল্টু পাকড়াশিকে সে ভালই চেনে। মানিব্যাগ চুরি করার মতো ছোটখাটো কাজ করার লোক সে নয়। দরকার পড়লে গলায় ছুরি দিয়ে ছিনতাই করবে, আর হাটুরে মার খাওয়ার আগে অন্তত আট-দশজনকে ঘায়েল না করে ছাড়বে না। তাই তার অঙ্কটা মিলছে না। মনটা খুঁতখুঁত করছে। সুতরাং মহাদেবের সঙ্গে সে একদিন থানার লকআপে আসামিকে দেখতে গিয়েছিল। আর দেখে তার চক্ষুস্থির! নবীন দাসকে সে ভালই চেনে। নবীনের বাবা মাধবগঞ্জের পীতাম্বর দাসের সঙ্গে

তার একসময় দহরম-মহরম ছিল।

বেরিয়ে এসে সে মহাদেবকে বলল, "কথাটা ফাঁস কোরো না, কিন্তু কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। এ ছেলেটা পল্টু পাকড়াশি নয়।"

"অ্যাঁ। তবে এ কে?"

"মাধবগঞ্জের পীতাম্বর দাসের ছেলে নবীন।"

"হ্যাঁ বটে, শুনেছি ছোঁড়া নাকি নিজের ওই নামটাই বলছে। কেউ অবশ্য বিশ্বাস করেনি।"

"পল্টুর সঙ্গে বেচারার খুব মিল আছে। তাই ভাবছি ব্যাপারটা কী!"

"তা ছোঁড়াটাকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।"

"সেপাইটা তো কথাই কইতে দিল না, দেখলে তো! বড়বাবুর নাকি নিষেধ আছে।"

"তা হলে কী করবে?"

"ক'টা দিন থাকতে হবে এখানে। কাণ্ডটা কী হয়, তা না দেখে যাচ্ছিই না।"

"সেই ভাল। চেপে বসে থাকো।"

আর গতকাল সকালেই কাণ্ডটা ঘটেছে। সাইকেলটায় পাম্প করাতে বটতলা ছাড়িয়ে মদনের সাইকেলের দোকানে গিয়েছিল বিশু। নিচু হয়ে যখন হাওয়া টাইট হয়েছে কি না দেখছিল, তখনই হঠাৎ নজর পড়ল, তিন জোড়া পা তার পিছন দিকে বাঁ থেকে ডাইনে যাচ্ছে। আড়চোখে তাকাতেই বিশু চমকে গেল। একজন নগেন পাকড়াশির পোষা গুন্ডা চণ্ডীচরণ, তার সঙ্গে ভাড়াটে খুনে বগা, আর তিন নম্বর লোকটা দাড়ি-গোঁফওয়ালা, চোখে রোদচশমা আর মাথায় টুপি থাকায় চেনা যাচ্ছিল না। কিন্তু ওই হাঁটার কায়দা আর ঘাড়ের উপর দিকে একটা কাটা দাগ দেখে পল্টুকে চিনতে

তেমন অসুবিধেই হল না তার। অবিশ্বাস্য! নিজের চোখকেই তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। অবিকল সাপের মতোই একবার ফোঁস করল সে।



মৃদুভাষিণী দেবীর একটা মুশকিল হয়েছে আজকাল। যখন আহ্নিকে বসেন বা যখন রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরে যান কিংবা যখন সন্ধেবেলা পুরনো গির্জায় যিশুর মূর্তির সামনে মোমবাতি জ্বেলে দু'খানি বাতাসা ভোগ দেন, তখনও একই দেবতাকে দেখতে পান। ইষ্টদেবতা, রাধাগোবিন্দ জিউ আর যিশু একাকার হয়ে যাওয়ায় তাঁর মুশকিলটা হয়। একদিন চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে ধন্ধটার কথা বলেওছিলেন। চক্কোত্তিমশাই বুড়ো মানুষ, জ্ঞানবৃদ্ধ। গুড়ুক-গুড়ুক তামাক খেতে খেতে দুলে দুলে খুব হাসলেন। বললেন, "আমারও তো ওই গোলমাল গো ঠাকরোন। কাকে বাছি, কাকে রাখি। কত রূপ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন...নিতি নব নটলীলা।"

"পাপ হচ্ছে না তো বাবা?"

"যিশু ভজলে পাপ হয় বুঝি? যে বলে সে আহাম্মক।"

"তা বলে সবাইকে সমান দেখা কি উচিত হচ্ছে বাবা?"

"যত উপরে উঠবি, তত সব সমান দেখবি। উপরে উঠবি তো নাম-বেলুন।"

"নাম মানে কি মন্তর নাকি বাবা?"

"হুঁ।"

মৃদুভাষিণী সেই থেকে সার বুঝেছেন। ভাঙা গির্জায় একা পড়ে থাকেন যিশুবাবা। বড্ড মায়া হয় তাঁর।

আজ সন্ধের মুখে একটু হিমভাব। মৃদুভাষিণী সন্ধের সময়টায় যখন গির্জায় মোম জ্বেলে দিচ্ছেন, তখন আচমকা মনে হল, একটা বাচ্চা মেয়ের হাসির শব্দ শুনলেন যেন। খুশির হাসি।

চমকে উঠে চারদিকে চাইলেন, "কে রে? কে লুকিয়ে আছিস?"

আর কোনও শব্দ নেই। মৃদুভাষিণীর অবশ্য ভয় হল না। যিশুর মন্দিরে কি ভয়ের কিছু থাকতে পারে? তবে ভাবনা হল। সকালেই প্রাণপতির ফুটফুটে মেয়েটাকে কে যেন চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। তার কোনও অমঙ্গল হল না তো!

যখন গির্জা থেকে বেরিয়ে দরজাটায় তালা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন, তখন ফের শুনতে পেলেন গির্জার ভিতর একটা বাচ্চা মেয়ের হাসির শব্দ। না, শুধু হাসির শব্দই নয়, ছোট ছোট পায়ে গির্জার ভিতরে যেন ছোটাছুটি করছে এক শিশু, কার সঙ্গে যেন খেলছে।

জোড়হাতে মৃদুভাষিণী বিড়বিড় করে বললেন, "রক্ষে করো যিশুবাবা, রক্ষে করো।"

প্রাণপতি আজ নিজেকে নিজেই চিনতে পারছেন না। শুধু বুঝতে পারছেন তিনি আর আগের প্রাণপতি নেই। দার্শনিক প্রাণপতি কোথায় নিরুদ্দেশ হল এবং কেনই বা, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁর নেই।

কে বা কারা তাঁর ফুটফুটে মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। অন্য সময় বা আগের প্রাণপতি হলে তিনি শয্যা নিয়ে ফেলতেন,

কান্নাকাটি করতেন এবং পুলিশের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতেন। কিন্তু নতুন প্রাণপতি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। মেয়ের স্কুলের দিদিমণিদের জেরা করলেন, মধুছন্দার বন্ধুদের কাছেও খোঁজ নিলেন।

জানা গেল, ছুটির পর একজন সেপাইয়ের পোশাক পরা লোক এসে মধুছন্দাকে বলে, "চলো খুকি, তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন।"

"তুমি কে?"

"আমার নাম তপন দাস। এ থানায় নতুন এসেছি।"

"কিন্তু আমি তো রোজ একা-একাই বাড়িতে ফিরি। আজ তোমার সঙ্গে যাব কেন?"

"বড়বাবু যে নতুন মোটরবাইক কিনেছেন। সেটাতে চড়িয়ে তোমাকে থানা থেকে বাড়ি নিয়ে যাবেন বলে আমাকে পাঠালেন।"

মধুছন্দা খুব অবাক হয়েছিল, খুশিও। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে তপন দাসের সঙ্গে সে চলে যায়।

প্রাণপতি খবর নিয়ে জানলেন, তপন দাসের চেহারা বেশ গাট্টাগোট্টা, গোঁফ আছে, মাথায় ঘন চুল, হাতে লোহার বালা।

গাঁয়ের লোকরাও কেউ কেউ জানাল যে, তারা খুকিকে একজন সেপাইয়ের সঙ্গে রথতলার দিকে যেতে দেখেছে। কিন্তু কিছু সন্দেহ করেনি।

ঘণ্টা দুয়েক ধরে সার্চ পার্টি সারা গাঁ খুঁজে দেখল। কোথাও মেয়েটাকে পাওয়া গেল না। প্রাণপতি সারাদিন নিজেও ঘুরে-ঘুরে নানা জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। চিরকুটটাকেও ভাল করে পরীক্ষা করলেন। মেয়ে চুরি যাওয়া নিয়ে যতটা না ভাবলেন, তার চেয়ে বেশি ভাবলেন ওই লম্বা টেকো, কটা চোখের লোকটাকে নিয়ে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ওই লোকটার সঙ্গে ঘটনার যোগ আছে।

দুপুরবেলা উদ্ধবকে ডেকে পাঠালেন তিনি। উদ্ধব কাঁপতে কাঁপতে এল। প্রাণপতি বললেন, "উদ্ধব, সেই ঢ্যাঙা লোকটাকে তুমি চেনো?"

মাথা নেড়ে উদ্ধব বলে, "না হুজুর, ঠিক চিনি না।"

"কিন্তু সকালে তোমার কথা শুনে তো তা মনে হল না।"

"চেনা বলতে যা বোঝায়, তা নয় বড়বাবু।"

"তা হলে?"

"আমি রাতবিরেতে মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে শুয়ে থাকি। ঘরে শুলে আমার কেমন দম আটকে আসে। মাঝে-মাঝে শীতলসাহেবের ভাঙা গির্জার দরজার সামনের জায়গাটায়ও শুই। রোজ সকালে হুজুর, গির্জার ভিতরে ঝাঁটপাটের শব্দ হয়। গির্জায় ইঁদুর, আরশোলা ছাড়া আর কিছু তো থাকার কথা নয়। তাই একদিন জানলার ভাঙা শার্শি দিয়ে উঁকি মেরেছিলুম।"

"কী দেখলে?"

"আজ্ঞে, ওই মানুষটাকে। খুব লম্বা, মাথায় টাক, কটা চোখ, গায়ে জোব্বা মতো। ডান্ডি লাগানো বুরুশ দিয়ে ঘর ঝাঁটাচ্ছেন।"

"এসব তো ভুতুড়ে গল্প, বিশ্বাসযোগ্যই নয়।"

"আজ্ঞে হুজুর, আমার চোখের বা মনের ভুলও হতে পারে।"

"ধরলাম, ওরকম একজন মানুষ বা ভূত আছে। কিন্তু সে হঠাৎ কাল সকালে আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিল?"

"তা জানি না হুজুর। কিন্তু উনি আপনার মেয়েকে চুরি করার মতো মানুষ নন বড়বাবু। উনি ভাল লোক।"

প্রায় একই কথা শোনা গেল মৃদুভাষিণীর কাছেও। বললেন, "বাবা প্রাণপতি, তোমার খুকি যেখানেই থাক, ভালই থাকবে। কিন্তু ওকে ছেলেধরা বলে ভেবো না। যিশুবাবার সেবা করে তো, ওরা ওরকম নয়।"

"আপনারা কি আমাকে পাগল করে দেবেন মাসিমা! গির্জায় ওরকম একটা লোক এল কী করে? শেষ অবধি ভূতে বিশ্বাস করতে বলছেন?"

"অত সব জানি না বাবা। তোমার মাথা এখন গরম। মাথাটা ঠান্ডা হলে ভেবো।"

"গির্জার আনাচ-কানাচ দেখা হয়েছে। সেখানে কেউ থাকে না, কেউ নেইও।"

"ওভাবে খুঁজলে কি পাওয়া যায়, বাবা?"

"তবে কীভাবে খুঁজব?"

"দোর ধরে পড়ে থাকলে হয়তো হয়। কিন্তু সে তুমি পারবে না।"

মেয়ের জন্য উদ্বেগে প্রাণপতির স্ত্রী বিজয়া সারাদিন বারকয়েক অজ্ঞান হয়েছেন, খাননি কিছু, প্রবল কান্নাকাটি করছেন। তবু মনের এই অবস্থায়ও তিনি তাঁর আলাভোলা স্বামীর পরিবর্তনটা লক্ষ করে একবার বললেন, "আচ্ছা, তোমাকে একদম অন্যরকম লাগছে কেন বলো তো!"

প্রাণপতি ভ্রু তুলে বললেন, "কীরকম?"

"কী জানি, বুঝতে পারছি না। কিন্তু যেন অন্য মানুষ। একদম অন্য মানুষ।"

প্রাণপতি এটা বুঝতে পারছিলেন যে, চিঠিতে লেখা শর্ত না মানলে তাঁর মেয়েটাকে হয়তো গুন্ডারা মেরে ফেলবে। শর্ত না মেনে সুতরাং উপায় নেই। কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারছেন না যে, আসামিকে এভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে কী লাভ? কারণ, হুলিয়া জারি আছে, কাল সকালেই সদর থেকে ফোর্স আসবে এবং ওদের পালানো মুশকিল হবে। তা হলে কি ছেড়ে দিতে বলার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে?

রাত্রিবেলা তিনি যখন নবীনকে ছেড়ে দেবেন বলে স্থির করলেন, তখন ফটিক বলল, "কাজটা কি ঠিক হবে স্যার? আমাদের চাকরি নিয়ে না টানাটানি পড়ে যায়!"

"ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাকরি গেলে আমার যাবে। তোমাদের দোষ হবে না, ভয় নেই।"

ফটিক একটু গোঁজ হয়ে রইল।

রাত বারোটায় নবীনকে লকআপ থেকে ছেড়ে দিলেন তিনি। নবীন বেরিয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

তারপর বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে এলেন।

সেপাইদের মধ্যে ফটিক আর বক্রেশ্বর জিজ্ঞেস করল, "আমরা সঙ্গে যাব স্যার?'"

"না, আজ আমাকে একাই যেতে হবে।"

কাজটা ঠিক হল কি না, তা প্রাণপতি বুঝতে পারছিলেন না।

নিশুতি রাতে তিনি একা হাঁটতে হাঁটতে গির্জাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। টর্চ জ্বেলে পুরনো নোনাধরা ভগ্নপ্রায় গির্জাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। এই গির্জার কি কোনও মহিমা থাকা সম্ভব? তিনি ভূত বা ভগবানে বিশ্বাসী নন। কিন্তু উদ্ধব আর মৃদুভাষিণী যা বলছেন, তা ভুতুড়ে ব্যাপার। নয় তো কোনও একটা লোক খ্রিস্টান যাজকের মতো সেজে ওদের ঘোল ঘাওয়াচ্ছে। দ্বিতীয়টাই সত্যি বলে মনে হয়।

টর্চটা নিভিয়ে তিনি চুপচাপ অন্ধকার গির্জাটার দিকে চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনও শব্দ নেই। ঘটনা নেই।

কিন্তু আবহাওয়ায় তিনি একটা বিপদ-সংকেত পাচ্ছেন। ঘটনার গতি ও প্রকৃতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে আজ রাতেই হয়তো কিছু একটা ঘটবে। কী ঘটবে, সেটাই বুঝতে পারছেন না তিনি।

কাছাকাছি কোনও লোক এসে দাঁড়ালে তার শরীরের তাপ হোক

বা গন্ধ হোক, কিছু একটা টের পাওয়া যায়, সে যত নিঃশব্দেই আসুক না কেন। প্রাণপতিও টের পেলেন। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার বলে কিছু দেখার উপায় নেই। টর্চটা জ্বালাবেন কি না বুঝতে পারছেন না। লোকটা শত্রু না মিত্র, তা জানেন না। কিন্তু তাঁর ঘাড় শক্ত হয়ে গেল এবং শরীরের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। নির্ভুল টের পাচ্ছেন, তাঁর পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

স্বভাবসিদ্ধ আত্মরক্ষার তাগিদেই কোমরের পিস্তলটার দিকে হাত বাড়িয়েও হাতটা সরিয়ে নিলেন। কাজটা বোকামি হবে। পিস্তল বের করার আগেই লোকটা যা করার করে ফেলবে। তাই তিনি আচমকা নিচু হয়ে দ্রুত মাটিতে ঝাঁপ খেয়ে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু ডান্ডাটা এড়াতে পারলেন না। মাথার ডান ধারে একটা কঠিন আঘাত লাগতেই চোখে অন্ধকার দেখে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

তাঁর পড়ে থাকা শরীরটা ডিঙিয়েই তিনজন লোক আর-একটা লোককে টানতে টানতে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে গির্জার দিকে নিয়ে চলল।

গির্জার দরজা খুলে চারদিকে একটা জোরালো টর্চ ফেলে একজন বলল, "মেয়েটা কোথায়?"

আর-একজন জবাব দিল, "এখানেই আছে। আমি নিজে মেয়েটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে গিয়েছি। চাবি আমার কাছে।"

"মেয়েটা কোথায় খুঁজে দেখ। দারোগাটা কিছু একটা সন্দেহ করে এখানে এসেছিল, কাজেই আমাদের চটপট কাজ শেষ করে পালাতে হবে।"

যে লোকটাকে ছেঁচড়ে আনা হয়েছে, সে মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

দ্বিতীয় লোকটা বলল, "সে তো বুঝলুম, কিন্তু এতটা পথ আসতে হয়েছে, একটু জিরোতে দাও।"

"জিরোতে গেলে ধরা পড়ার ভয় আছে। আচ্ছা, পাঁচ মিনিট। কিন্তু তার আগে মেয়েটাকে খুঁজে দেখ।"

"বাচ্চা মেয়ে, কোথাও গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। পরে দেখা যাবে।"

পাঁচ মিনিটও কাটেনি। হঠাৎ একটা শব্দে তিনজনেরই চটকা ভাঙল এবং তারা অবাক হয়ে দেখল, যিশুর মূর্তির সামনে বেদির উপর মস্ত বড় একটা সাদা মোম কে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে, দু' ধারে ভাঙা বেঞ্চের স্তূপ আর মাঝখানে চওড়া একটা প্যাসেজ। সেই প্যাসেজটায় বেদির দিক থেকে একটা লাল রঙের বল গড়িয়ে আসছে। তার পিছনেই খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঝাঁকড়া চুলওলা একটা মেয়ে দৌড়ে আসছে।

চণ্ডী বলল, "ওই তো দারোগার মেয়েটা!"

ভ্রু কুঁচকে পল্টু পাকড়াশি বলল, "কিন্তু মোমটা জ্বালাল কে?"

"তা তো জানি না।"

"ভাল করে দেখ। গির্জায় লোক ঢুকেছে নিশ্চয়ই।"

তিনজনই লাফিয়ে উঠল। টর্চ নিয়ে চারদিকে খুঁজে দেখতে লাগল। কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না।

চণ্ডী অবাক হয়ে বলে, "ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি রে বাবা!"

"মেয়েটাকে ধরে জিজ্ঞেস কর। ও নিশ্চয়ই জানে।"

কিন্তু মেয়েটা তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপও না করে সারা গির্জা বলের পিছনে ছুটছে আর হাসছে। কখনও হাততালি দিয়ে উঠছে।

চণ্ডী তার পিছনে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগল, "ও খুকি, শোনো, শোনো। মোমটা কি তুমি জ্বালিয়েছ?"

মেয়েটা জবাব দিচ্ছে না। সামনে বলটা কেবলই গড়িয়ে যাচ্ছে।

আপনা থেকেই ডাইনে গড়িয়ে যাচ্ছে, আবার বাঁয়ে। মেয়েটার সঙ্গে ছুটে পেরে উঠছে না হোঁতকা চণ্ডী। হাঁপসানো গলায় বলল, "ওরে পল্টু, ওকে সামনে থেকে ধরে থামা।"

মেয়েটা প্যাসেজে ঢুকতেই পথ আগলে দাঁড়াল পল্টু। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মেয়েটা দিব্যি তার হাত এড়িয়ে লহমায় পেরিয়ে গেল তাকে। বগা মেয়েটাকে দু' হাতে জাপটে ধরার চেষ্টা করতে গেল। কীভাবে যে হাতের ফাঁক দিয়ে গলে গেল, তা বোঝাই গেল না। মেয়েটা যেন তাদের দেখতেই পাচ্ছে না, এমন ভাবে ছুটছে বলটার পিছনে। আর বলটাও দিব্যি গড়িয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই।

চণ্ডী বলল, "কী ব্যাপার বল তো, কী হচ্ছে এসব?"

পল্টু দাঁত কড়মড় করে বলল, "মেয়েটা বহুত চালাক। ধর ওকে, নয়তো বিপদ।"

সুতরাং, তিনজনই তিন দিক থেকে মেয়েটাকে রোখার চেষ্টা করতে লাগল। দৌড়ে, ঝাঁপিয়ে, ল্যাং মেরে কোনও ভাবেই তারা কিছু করে উঠতে পারছিল না। মেয়েটা খিলখিলিয়ে হাসছে আর মনের আনন্দে ছুটে বেড়াচ্ছে। কখনও যিশুবাবার বেদিতে উঠে যাচ্ছে, কখনও ভাঙা বেঞ্চের স্তূপের উপর দিয়ে লাফিয়ে, ডিঙিয়ে যাচ্ছে, হাঁফিয়ে পড়ছে না, ক্লান্ত হচ্ছে না।

কিন্তু মেয়েটার পিছনে ধাওয়া করতে করতে ক্রমে ক্রমে তিনজন হাঁফিয়ে পড়ছিল। একসময় কোমরে হাত দিয়ে চণ্ডীচরণ দাঁড়িয়ে পড়ল। বগা একটা ভাঙা বেঞ্চে পা আটকে দড়াম করে পড়ল। পল্টু বুক চেপে বসে পড়ল হঠাৎ।

প্রাণপতিকে দু'জন লোক দু' দিক থেকে ধরে তুলে বসাল।

"কেমন আছেন বড়বাবু?"

মাথাটা এখনও টনটন করছে, কিন্তু প্রাণপতি বুঝতে পারছেন,

ব্যথাটা অসহ্য নয়। তিনি নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক আছি। কিন্তু সেই লোকগুলো কোথায় গেল?"

ভুবন মণ্ডল বলল, "ওই গির্জায় ঢুকেছে। মনে হয়, এতক্ষণে নবীন দাসকে মেরে ফেলেছে।"

বিশু গায়েন বলল, "লাশটাকে পল্টু পাকড়াশির লাশ বলে চালিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে।"

ভুবন মণ্ডল মাথা নেড়ে বলল, "পল্টুর কোমরে পিস্তল আছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। কুড়ুল নিয়ে যে হামলা করব, তাতে লাভ হওয়ার নয়। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে।"

পিস্তলটা হাতে নিয়ে গির্জার দিকে এগোতে এগোতে প্রাণপতি বললেন, "ভোর হতে আর দেরি নেই। ওরা কি আর এতক্ষণ গির্জার ভিতর বসে আছে! পিছনের কোনও চোরা দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই।"

গির্জার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। প্রাণপতি দরজায় ঘা দিয়ে বললেন, "দরজা খোলো।"

দরজা অবশ্য খুলল না। প্রাণপতি বারবার ঘা দিতে লাগলেন।

ভোরের পাখিরা ডাকছে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। আলো ফুটে উঠল একটু একটু। আর এই সময় বড়, কালো একটা পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়াল গির্জার সামনে। ভ্যান থেকে লাফ দিয়ে নেমে ফটিক চেঁচিয়ে উঠল, "সদর থেকে ফোর্স এসে গিয়েছে স্যার!"

দশ-বারোজন বন্দুকধারী সেপাই নেমে প্রাণপতিকে স্যালুট ঠুকে বলল, "কী করতে হবে স্যার।"

চিন্তিত প্রাণপতি বললেন, "গির্জার দরজাটা ভাঙা হোক, এটা আমি চাই না। কনফ্রন্টেশনও নয়। কারণ, আমার মেয়েটা ওদের হেফাজতে রয়েছে। আপনারা বরং গির্জাটা ঘিরে থাকুন।"

তাই হল।



সূর্যের প্রথম রশ্মি গির্জার মাথার উপরকার ক্রসটাকে ছুঁয়ে ফেলল। গির্জার সামনের দরজাটা খুলে গেল আস্তে আস্তে। ক্লান্ত, বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত তিনজন লোক মড়ার মতো চোখ চেয়ে হাত উপরে তুলে বেরিয়ে এল। পল্টু ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, "গুলি চালাবেন না। আমি সারেন্ডার করছি।"

তাদের ভ্যানে তোলার পর নবীন টলতে টলতে বেরিয়ে এসে মাথায় দু' হাত চেপে সিঁড়িতে বসে পড়ল। বলল, "ভাববেন না বড়বাবু, আমার তেমন কিছু হয়নি।"

"কিন্তু আমার মেয়েটা!"

"বাবা! এই তো আমি!" বলে ফুটফুটে মধুছন্দা দরজায় এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটা লাল বল।

প্রাণপতি স্মিত হাসলেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওরা তোকে মারধর করেনি তো?"

"না তো! আমি তো সারারাত একটা ছোট্ট ঘরে সুন্দর একটা বিছানায় ঘুমিয়েছিলাম। ওরা কারা বাবা?"

"ওদের কথা তোমার মনে রাখার দরকার নেই।"

নবীন দাস ছাড়া পেয়ে মাধবগঞ্জে ফিরে গিয়েছে। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছে, "নগেন পাকড়াশির ওই পাপের টাকার দরকার নেই আমার। চার বিঘে জমি আছে, চাষবাস করলে আমার চলে যাবে।"

কিন্তু প্রাণপতির অনেক হিসেবই মিলছে না। আসামি তিনজনই বলেছে যে, গির্জার মধ্যে সারারাত তারা প্রাণপতির মেয়েকে ধাওয়া করেও ধরতে পারেনি। মেয়েটা তাদের হয়রান করে, বেদম করে দিয়েছিল। প্রাণপতি জানেন, কথাটা সত্যি নয়। মধুছন্দা রাত্রে

কোথাও একটা বিছানায় ঘুমিয়েছিল। তা হলে সেই মেয়েটা আসলে কে? প্রশ্ন আরও আছে। তাঁর যে মাথায় নানারকম উদ্ভট চিন্তার উদয় হত, সেগুলো উধাও হল কেন? এসব ভেবে মাঝে-মাঝে তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কয়েকদিন পরে সন্ধেবেলা মৃদুভাষিণী দেবী টুকটুক করে গিয়ে গির্জার তালা খুলছেন, পাশেই দেখলেন, প্রাণপতি দাঁড়িয়ে।

"ও বাবা! প্রাণপতি যে!"

"আপনার যিশুর কাছে আমার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন মাসিমা?"

"কী প্রার্থনা বাবা?"

"আমার মাথায় আগে নানারকম সুন্দর সুন্দর চিন্তা আসত, তাতে বেশ আরামে থাকতাম। সেই চিন্তাগুলো সব হারিয়ে গিয়েছে। আপনার যিশুবাবাকে বলুন, আমার চিন্তাগুলো যেন ফিরে আসে।"

"সে আর বেশি কথা কী! তা তুমিই কেন যিশুবাবাকে বলো না।"

"আজ্ঞে, ভারী লজ্জা করে যে!"

"ও মা, যিশুকে লজ্জা কীসের?"

"আমি যে নাস্তিক!"



9789350400944

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

অষ্টপুরের বৃত্তান্ত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



আনন্দ

অষ্টপুরের বৃত্তান্ত • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ